সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেমের গল্প

প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৭

ভয়

কে শত্রু কে বন্ধু

রানি ও অবিনাশ

মনীষার দুই প্রেমিক

মঞ্জরী

নীরার অসুখ

ভিতরের চোখ

অপরেশ রমলা ও আমি

আমাদের মনোরমা

ভূমিকা

প্রেমে না পড়লে কেউ কবিতা লেখে না। মহর্ষি বাল্মীকির কথা আলাদা, তাঁর অবশ্য নিজের প্রেম কিংবা প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি একজোড় কোঁচ বককে প্রেমিক-প্রেমিকা কল্পনা করে তাদের মধ্যে একটিকে নিহত হতে দেখে যে শোক পেয়েছিলেন, তার থেকেই উৎসারিত হয়েছিল প্রথম শ্লোক। আমার মতন ক্ষুদ্র মানুষের ব্যাপার অন্য, আমি অন্য কারুর প্রেম-বিরহ দেখে অভিভূত হয়ে নয়, নিজেরই ব্যর্থ প্রেমের পর কবিতা রচনা শুরু করি।

তারপর গল্প-উপন্যাস রচনায় হাত দিয়ে দেখেছি প্রেম বা বিচ্ছেদের কাহিনিই আমার বেশি মনে আসে। আমি জীবনে প্রথম যে ছোটোগল্পটি লিখেছিলাম, সেটি একটি পত্রিকায় পাঠাবার পর পত্রিকাটিই উঠে যায়। আমার পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে কালের অতল গর্ভে। গল্পটির নাম ছিল 'বাঘ'। শুধু এই নামটুকুই মনে আছে, আর সবই ভুলে গেছি বলে সেটি আর ফিরে লেখারও উপায় নেই। তারপর কত যে ছোটোগল্প লিখে ফেলেছি, তার সংখ্যা নিজেই জানি না। কোনো কোনো পাঠকের মতামত এই যে, আমি নাকি প্রেমের গল্পই বেশি লিখেছি। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, এখন আমার যথেষ্ট বয়েস হলেও প্রেম সম্পর্কে আগ্রহ কিংবা টান ফুরিয়ে যায়নি। পরবর্তী যে গল্পটি এখনো মাথার মধ্যে গজগজ করছে, সেটিও একটি প্রেমেরই কাহিনি।

এতসব প্রেমের গল্প থেকে অনেক বেছে এই গল্পগুলি এখানে গ্রন্থিত হলো। নির্বাচন আমার নয়, কারণ তাতে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে, করে দিয়েছেন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক শুভার্থী। আশা করি, পাঠকের রুচির সঙ্গে তা মিলে যাবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়

তোমাকে তো আমি বললাম, আমার খুব দরকারি একটা কাজ ছিল! আর থাকতে পারব না। সেইজন্যই হঠাৎ তাড়হুড়ে করে চলে এলাম। আসলে কিন্তু আমার কোনো কাজই ছিল না। দ্যাখো না, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি।

কেন যে চলে এলাম! আসল কারণটা বলব? রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল।

এই পর্যন্ত পড়েই শান্তনু এমন রেগে গেল যে চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলল মাটিতে।

সব সময় খালি ভয় আর ভয়। এই ভয়ের জ্বালায় আর পারা যাবে না। ওরা কি চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুন করেছে যে সব সময় ভয় পেতে হবে?

যেদিনকার কথা লিখেছে স্নিগ্ধা, সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সকাল এগারোটার সময়। সেই সময় চেনাশুনো

অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। অফিস পালিয়ে আসতে হয়েছিল শান্তনুকে। অফিসেরই কাজ নিয়ে ডালহৌসিতে যাবার বদলে চলে এসেছিল আলিপুরে।

কলকাতা শহরের যে-কোনো জায়গায় দেখা করতেই ভয় পায় স্নিগ্ধা। সারা কলকাতাতেই নাকি ওর আত্মীয়স্বজন ছড়নো। সেইসব আত্মীয়রা ধারালো চোখ নিয়ে সব সময় পথে পথে ঘুরে বেড়চ্ছে স্নিগ্ধাকে দেখে ফেলার জন্য।

স্নিগ্ধার বাড়িতে ফোন করার উপায় নেই, চিঠি লেখার উপায় নেই। বাইরে দেখা করতে গেলে তো প্রায় একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে হয়।

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে। প্রত্যেক চিঠিতেই সে আকুতি জানায়, কখন শান্তনুকে দেখবে। শান্তনুকে সে প্রত্যেকদিন দেখতে চায়, অথচ দেখা করতেও ভয়। এ তো মহা মুশকিল।

একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার উপায় নেই। কোনো প্রকাশ্য জায়গায় পাশাপাশি বেড়বার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটা মাত্র জায়গা আছে, মিউজিয়াম, যেখানে কলকাতার বাঙালিরা সাধারণত যায় না। কিন্তু সেখানেও যাওয়া চলে না বারবার, স্নিগ্ধার ধারণা, দারোয়ান, চাপরাশিরা তাকে চিনে ফেলেছে। চিনে ফেললেই যে কী বিপদ, তা বোঝে না শান্তনু। চিনুক না। তারা তো মিউজিয়ামে কিছু চুরি করতে যাচ্ছে না।

আর একটা জায়গা হচ্ছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি। এখানে স্নিগ্ধাকে মাঝে মাঝে বই নিতে আসতে হয়। বাড়ির অনুমতি আছে। তাও স্নিগ্ধা আসবে সকালের দিকে। বিকেলে বা সন্ধেবেলা এখানে অনেক ভিড় হয়ে যায়, তাদের মধ্যে চেনাশুনো কেউ কেউ তো থাকতেই পারে। অফিসের দিনে সকাল সকাল আসতে গেলে শান্তনুকে যে কী অসুবিধেয় পড়তে হয়, তা সে শুধু নিজেই জানে, স্নিগ্ধাকে বলেনি কখনও।

শান্তনু এটাই শুধু বুঝতে পারে না, কেউ দেখে ফেললেই বা ভয়ের কী আছে? সে স্নিগ্ধাকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর। স্নিগ্ধাও অন্য কারুকে বিয়ে করবে না, বাড়ির যদি খুব অমত থাকে, স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে চলে আসতেও রাজি।

অবশ্য স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে আপত্তি করার বিশেষ কোনো কারণও নেই। শান্তনু পড়শুনোয় ভালো ছিল, এখন মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। পরিচ্ছন্ন সচ্ছল পরিবারের ছেলে। স্নিগ্ধাদের বাড়িতে জাত-বিচারের বাড়বাড়ি নেই, স্নিগ্ধার জ্যাঠতুতো দাদা অসবর্ণ বিয়ে করলেও বাড়ির লোক তাদের ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে।

মুশকিল বাধিয়েছেন স্নিগ্ধার বাবা। ভদ্রলোক বেশ ভালোমানুষ, অর্থনীতির অধ্যাপক, বেশ সুরসিক। কিন্তু তিনি হঠাৎ ইরানে ভিজিটিং প্রফেসারের চাকরি নিয়ে চলে গেছেন এক বছরের জন্য। ওঃ, সেই এক বছরটা কী অসম্ভব লম্বা স্নিগ্ধার বাবাকে এখনও কথাটা জানানোই হয়নি।

স্নিগ্ধা চিঠি লিখে বাবাকে জানাতে চায় না। বাবা ভাববেন, তিনি নেই বলে মেয়ে প্রেম করে বেড়চ্ছে। শান্তনুকে চোখে না দেখে বাবা বুঝবেন কী করে যে কোন রকম ছেলে সে। বাবা ফিরে এলে সে বাবাকে নিজের মুখে বলবে। এই জন্য মাকেও কিছু জানতে দিচ্ছে না। কারণ মা তাহলেই বাবাকে চিঠি লিখবেন। অতদূর ইরান থেকে তো শুধু শুধু হঠাৎ চলে আসা যায় না। বাবা যদি চিঠি পেয়ে চলে আসেন, সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।

শান্তনু অবশ্য এক বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছে। কী আসে যায় এক বছরে। কিন্তু তা বলে কি এই এক বছর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ থাকবে? স্নিগ্ধার যুক্তি হচ্ছে, যদি কোনো রকমে কোনো আত্মীয়স্বজন একবারও স্নিগ্ধাকে শান্তনুর সঙ্গে ঘুরতে দেখে, তাহলেই তারা কথাটা মায়ের কানে তুলবে। মা অমনি বাবাকে চিঠি লিখবেন। বাবা অতদূরে বসে দুঃখ পাবেন। বাবাকে যে দারুণ ভালোবাসে স্নিগ্ধা।

শান্তনু ঠাট্টা করে, তোমার আত্মীয়স্বজনদের কি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে তোমার পাশে কোনো ছেলেকে হাঁটতে দেখলেই অমনি তোমার মায়ের কাছে নালিশ করতে যাবেন?

স্নিগ্ধা বলে, নালিশ নয়, এমনি যদি কথায় কথায় বলে দেয় কেউ—

বলুক না। তোমার মাকে তুমি বুঝিয়ে বলবে।

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা আর ভয়। এই দুটো জিনিসই যেন ভালোবাসার প্রধান শত্রু। সব সময় দুজনে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে একটু দেখা করার জন্য, কাছাকাছি বসে একটু কথা বলার জন্য— আর কেউ এতে বাধা দিচ্ছেও না। যত বাধা এই লজ্জা আর ভয়।

সেদিন অত কষ্ট করে শান্তনু গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ভেতরে কথা বলার সুযোগ নেই, তাই ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে একটা গাছের নীচে। পাতলা রোদ সবুজ ঘাসে মোলায়েম হয়ে ছড়িয়ে আছে।

স্নিগ্ধার হাতে দুটি বই। একটা শান্তনুকে দিয়ে বলল, এটা তোমার হাতে রাখো।

কেন?

তাহলে সবাই ভাববে, তুমিও বই নিতে এসেছ লাইব্রেরিতে।

শান্তনু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, এখানে সবাইটা কোথায়? কেউ তো নেই। আমাদের শুধু দেখছে ওই বজ্রে বজ্রে গাছগুলো।

স্নিগ্ধা বলল, আস্তে আস্তে তো লোকজন আসবে।

শান্তনু বলল, চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।

স্নিগ্ধা একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, না।

কেন, এতে আবার কী অসুবিধে?

এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই তো ভালো লাগছে।

স্নিগ্ধা কারণটা না বললেও শান্তনু বুঝল। ঘাসের ওপর বসলে দৃশ্যটা অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বললে, কেউ দেখে ফেললেও মনে করবে, দুজন ছাত্রছাত্রী বুঝি পড়শুনোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

একটা উজ্জ্বল লাল রঙের সোয়েটার পরে ছিল স্নিগ্ধা। মাথার চুল এক বেণী করে বাঁধা। নামের সঙ্গে তার মুখটার খুব মিল আছে। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই কী রকম যেন ঠান্ডা লাগে। মুখে সব সময় একটা লজ্জা ভাব।

একটু বাদেই স্নিগ্ধা বলল, তুমি এবার যাবে না?

শান্তনু অবাক হয়ে বলল, চলে যাব? এক্ষুনি? কেন?

বাঃ, তোমার অফিস নেই?

সে আমি ঠিক ম্যানেজ করব।

না, না, অফিসে যদি তোমার নামে কেউ কিছু বলে, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

কে কী বলবে? আমি তো একটা কাজেই বেরিয়েছি, কাজটা ঠিকই সেরে ফিরব।

কাজটার জন্য এক ঘন্টার বেশি দেরিও তো হতে পারে।

স্নিগ্ধা ঠিক যেন মানলো না। তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে রইল। ঘাসে বসা হল না বলে শান্তনু প্রস্তাব করল একটু হেঁটে বেড়তে। স্নিগ্ধা তাতেও রাজি হতে চায় না। অনেক পেড়পীড়িতে সে এক পাক মাত্র ঘুরতে রাজি হল।

একবার স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখার জন্য শান্তনুর বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করে। কিন্তু তার উপায় নেই। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্নিগ্ধার শরীরের সুন্দর গন্ধটা উপভোগ করে শান্তনু। সবচেয়ে কি স্বাভাবিক ছিল না, স্নিগ্ধাকে এখন একবার জড়িয়ে ধরা? এখানে, প্রকাশ্যে, আকাশের নীচে তাকে একবার চুমু খাওয়া? কিন্তু সে তো কল্পনাই করা যায় না।

শান্তনু খপ করে স্নিগ্ধার একটা হাত চেপে ধরল।

স্নিগ্ধা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিল হাতটা। চোরা চোখে তাকে একবার বকুনি দিল। তারপর যেখান থেকে হাঁটতে শুরু করেছিল, সেইখানে এসেই স্নিগ্ধা বলল, এবার তুমি যাও।

এ কী, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাঃ, তোমার অফিসের কত দেরি হচ্ছে।

হোক।

না। না, আমার ভয় করে।

আবার ভয়! স্নিগ্ধাও হেসে ফেলল এবার। তারপর বলল, আমার মতন একটা বাজে বিচ্ছিরি মেয়েকে নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছ, তাই না?

শান্তনু বলল, খুব। দারুণ বিপদ ওই দ্যাখো। ওই একজন আত্মীয় আসছে তোমার।

কোথাও একজনও মানুষ দেখা যায় না। শুধু বড়েবড়ে গাছপালা ওদের দর্শক।

শান্তনু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, শোনো, আমরা যদি ওইখানে সরে গিয়ে ওই রাধাচূড় গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ই, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

কেন, ওখানে কী আছে?

কিছুই না। ওখানে দাঁড়লে আমাদের সহজে দেখা যাবে না।

ওখান দিয়ে লোকজন হাঁটে না বুঝি?

ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি, যদি একটি লোককেও ওখানে আসতে দেখি, এক্ষুনি আমরা চলে আসবো। লোক না-আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে দাঁড়বো। রাজি?

স্নিগ্ধাকে রাজি হতেই হল। জায়গাটা সত্যি নির্জন। তবু এই নির্জনতার মধ্যেও শান্তনু স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখলো না। চুমু খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একটু বেশি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, এক একবার কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায়, শান্তনু সিগারেট মুখে দিলে স্নিগ্ধা দেশলাই জ্বেলে দেয়। এইটুকুতেই অনেকখানি পাওয়া।

স্নিগ্ধা এক সময় বলল, বাঃ, লোক না এলেও বুঝি আমরা এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবো?

আমি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তুমি পারো না?

শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?

আমার তো শুধু তোমাকে দেখতেই ভালো লাগে।

আমার ভয় করে।

আবার ভয়? এখানেও ভয়?

স্নিগ্ধার চোখ দুটি আরও বেশি চঞ্চল। সে সুস্থির

হতে পারলে না কিছুতেই। এবার অনুনয় করে বলল, শোনো লক্ষ্মীটি, আমার একটা দারুণ কাজ আছে, আমাকে বারোটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

বারোটার মধ্যে? তাহলে তো এক্ষুনি যেতে হয়।

হ্যাঁ, বই দুটো বদলেই—

মোটে এইটুকু সময়ের জন্য আমি এলাম?

লক্ষ্মীটি রাগ করো না, আর একদিন…

কী কাজ তোমার?

বিশ্বাস করছো না? মাকে বলে এসেছি, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে…

স্নিগ্ধাকে আর আটকানো যায়নি কিছুতেই। শান্তনু খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এসেছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো সন্দেহ করত, স্নিগ্ধা বুঝি শান্তনুকে তেমন ভালোবাসে না। সে বুঝি শান্তনুর কাছে মিথ্যে কথা বলে অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু স্নিগ্ধা সম্পর্কে সেরকম সন্দেহ কিছুতেই করা যায় না। কারুকে ঠকাবার কোনো ক্ষমতাই নেই স্নিগ্ধার।

মেঝে থেকে শান্তনু স্নিগ্ধার দলা পাকানো চিঠিটা আবার তুলে নিল। পড়তে লাগল পরের অংশটুকু।

রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল। কীসের ভয় জানো? কারুর দেখে ফেলার ভয় নয়। ভয় করছিল নিজেকেই। আমার মনে হচ্ছিল, বেশিক্ষণ থাকলে, আমাকে যদি তোমার আর দেখতে ভালো না লাগে? আমি তো সুন্দরী নই। তুমি কত সুন্দর। তোমার সামনে আমাকে কেমন যেন…আমি বেশি সাজতেও পারি না, আমার ভয় হয়, যদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুমি হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নাও। আমার চিবুকটা বিচ্ছিরি, তাই না?

শান্তনু আবার অবাক হল। এ আবার কী রকম ভয়? স্নিগ্ধাকে তার দেখতে খারাপ লাগবে? যাকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করে, হঠাৎ কোথাও আচমকা দেখা হয়ে গেলে সে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যায়, সেই স্নিগ্ধাকে দেখতে তার খারাপ লাগবে? স্নিগ্ধার মতন সুন্দরী আর কে আছে? ওর চিবুকে একটা ছোট্ট কাটা দাগ, সেই জন্যই মুখটা আরও মিষ্টি দেখায়, ইচ্ছে করে ওই কাটা জায়গাটায় চুপুস করে একটা চুমু খেতে। এই জন্য স্নিগ্ধা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল! কোনো মানে হয়।

পরে কোথায় আবার দেখা হবে, সে সম্পর্কে স্নিগ্ধা কিছু লেখেনি। তার মানে এখন দু-তিন দিন আর স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে বেরুবে না। স্নিগ্ধার অন্য ভাইবোনরা ছোটো ছোটো। বাবা এখানে নেই বলে স্নিগ্ধাই যেন এখন বাড়ির অভিভাবক। ওর মতন নরম মেয়েকে কি ভাইবোনরা মানে একটুও? বাবা এখন এখানে নেই বলেই, সেই সুযোগে স্নিগ্ধা এখন প্রেম করে বেড়াচ্ছে—এই অপবাদটাকেই স্নিগ্ধার বেশি ভয়।

এদিকে অফিসের কাজে তিনদিন পর আবার শান্তনুকে পাটনা যেতে হবে। তার মানে এর মধ্যে আর স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হবে না? পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতেও তো তিন-চার দিন লাগবে। পাটনা যাওয়ার কথাটা স্নিগ্ধাকে জানাবেই-বা কী করে?

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে কিন্তু শান্তনুর চিঠি লেখার উপায় নেই। টেলিফোন করাও চলবে না। স্নিগ্ধাই কখনো-সখনো বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকলে শান্তনুকে টেলিফোন করে, বাড়িতে কিংবা অফিসে। যদি স্নিগ্ধা সেরকম ফোন করে…

পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনুর পাঁচদিন লেগে গেল। ফেরার পথে আর এক ঝামেলা। ট্রেন কলকাতায় এসে পৌঁছোবার কথা ভোরে, কিন্তু ইঞ্জিনে গণ্ডগোল হওয়ায় গাড়ি মাঝ রাস্তায় থেমে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা। আগের জংশনে খবর দিয়ে নতুন এঞ্জিন আনতে পাঁচ ঘন্টা কেটে গেল। অতক্ষণ থেমে থাকা ট্রেনে অপেক্ষা করা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তাও মাঠের মধ্যে। কিছুই করার নেই। নেমে পায়চারি করতে গেলেও চড় রোদ গায়ে বেঁধে। হঠাৎ শীত চলে গিয়ে গরম পড়ে গেছে। প্রথম গ্রীষ্ম দারুণ চিটচিটে হয়। ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলেও গরম, বাইরে রোদ্দুরে ঘোরাও অসম্ভব। ঘামে জামা-টামা চিটচিটে হয়ে গেল। মুখে বিরক্তির ভাঁজ।

হাওড় স্টেশনে পৌঁছেও আর এক ঝামেলা। ট্যাক্সি নেই। অনেক দৌড়েদৌড়ি করেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত, এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট গাড়ি ওকে হাজরা মোড় পর্যন্ত নামিয়ে দিতে রাজি হল।

হাজরায় পৌঁছে, হাতের ছোটো ব্যাগটা নিয়ে শান্তনু গাড়ির ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে যেই মুখ তুলল, অমনি দেখল এক অপরূপ দৃশ্য।

রাস্তার ওপারে, বাস গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। সঙ্গে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেই মেয়েটিও বোধহয় এক্ষুনি চলে যাবে, কেননা, একবার একটুখানি চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে কী যেন বলল। স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করার এমন আকস্মিক সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকের মধ্যে থেকে একটা খুশি লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু শান্তনু তার চিবুকে হাত বুলোল। দাড়ি কামানো হয়নি, বেশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি টের পাওয়া যাচ্ছে। মুখে চটচটে ঘাম। জামাটাও ঘামে জবজবে। সবচেয়ে বজ্জে কথা, ট্রেনে পাজামা পরে ছিল, তার ওপরেই শার্ট পরে নিয়েছে। এই চেহারায় সে স্নিগ্ধার সামনে দাঁড়বে?

শান্তনু আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সামনের চলন্ত মিনিবাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাড়িতে এসেই কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল আবার। এমন দুর্লভ সুযোগ পেয়েও সে স্নিগ্ধার কাছে যেতে পারল না? আজ যা দেরি হয়ে গেছে, অফিসে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই—স্নিগ্ধার সঙ্গে দুটো-চারটে কথাও বলতে পারত অন্তত, তবু কেন গেল না? তার লজ্জা করছিল? কিংবা ভয়?

পরদিনই স্নিগ্ধার চিঠি এল।

জানো, কাল তোমাকে দেখলাম। নিজের চোখকে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। হঠাৎ মনে হল যেন স্বর্গ থেকে দেবতারা আমার জন্য একটা পুরস্কার পাঠালেন। তুমি একটা কালো রঙের গাড়ি থেকে হাজরা মোড়ে নামলে। আমি হাত তুলে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার বোধ হয় খুব তাড় ছিল, তুমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লে। তুমি আমায় দেখতে পাওনি, আমি কিন্তু তোমায় দেখে নিয়েছি। আমার ভাগ্যটা কত ভালো বলো তো!

দাড়ি কামাওনি, মুখে নীল নীল দাড়ি, পাজামার ওপরে একটা লাল চেক চেক শার্ট পরেছিলে। তোমাকে কী ইয়াং আর কী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কে শত্রু কে বন্ধু

দোতলা বাসের জানলার ধারে বসবার জায়গা পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনেকটা দূরে যেতে হবে। বাসের অল্প আলোয় একটা বই খুলে পড়ছিলাম। কতটা সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি, হঠাৎ চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি আমার গন্তব্য পেরিয়ে গেছে। রাত প্রায় সাড়ে ন-টা। ব্যস্ত হয়ে বই মুড়ে দাঁড়লাম। বাসে তখন বেশ ভিড়। আমার সিট ছেড়ে সবেমাত্র বাইরে এসেছি, হঠাৎ আমার চোখে জগৎসংসার অন্ধকার হয়ে গেল, আমি পা দুমড়ে বসে পড়লাম।

উঃ করে একটা আওয়াজ করেছিলাম শুধু। হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলাম মুখ, তারপর কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই শুনতে পাইনি। চোখেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। শুনতে পেলাম, দু-তিনজন লোক জিজ্ঞেস করছে, কী হল মশাই? ও ভাই কী হল? আমি হাত দুটো চোখের সামনে আনলাম। দুহাত ভরা রক্ত।

বছর সাতেক আগের কথা। তখন কলকাতার পথেঘাটে মানুষ খুন করার উৎসবের রেওয়াজ ছিল না। আহত ও নিহত মানুষ দেখলে লোকে ফেলে পালাত না। চলন্ত বাসে অনেক লোক আমাকে ঘিরে ব্যাকুল হয়ে রইল।

আমার যে ঠিক কী হয়েছে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। আমার দুহাত ভরা শুধু রক্ত, আমার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে—কোনো ব্যথাও তখন টের পাচ্ছি না। লোকজন ধরাধরি করে আমাকে দাঁড় করাল। রক্ত তখনও পড়ছে অনর্গল। অনেকে চিৎকার করে বাস থামাল।

আমাকে কি কেউ জোরে মেরেছে? কিন্তু বাসের কোনো লোক আততায়ীকে দেখেনি। কেউ দুদ্দাড় করে নেমে চলে যায়নি। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হয়েছে যে, আমি ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ বসে না পড়লে কেউ লক্ষই করত না।

কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে সেরকম কিছু নেই।

একজন লোক আমার দিকে মুখ নীচু করে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাকে কে এরকম ঘুষি মারল?

আমি রক্তাক্ত মুখ তুলে লোকটিকে দেখতে চাইলাম। রক্তস্রোতে আমার বিস্ময় চাপা পড়েছিল। চোখেও যেন ঘোর লেগেছিল একটু।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে?

অনেকগুলি কণ্ঠ প্রশ্ন করলো, কে? কে? কে? কে?

উত্তর নেই।

কে মেরেছে, কেউ ঠিক বলতে পারছে না। একজনের হাত আমার মুখের সামনে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসতে দেখেছে। হয়তো সেই হাতে কঠিন কোনো জিনিস ছিল। খালি হাতে এতটা আঘাত লাগার কথা নয়। যে মেরেছে সে হয়তো এখনও বাসের দোতলাতেই রয়েছে।

দুর্ঘটনা নয়। কেউ আমাকে মেরেছে, এটা শুনেই আমার ব্যথা বোধ হতে শুরু করল। অসম্ভব তীব্র ব্যথা।

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি এখানেই নামব।

নিজে নামতে পারবেন?

আমি এবার সোজা হয়ে চারদিক তাকালাম। অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সবারই মুখ বন্ধুর মতন। যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেল।

আমি নামবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, একজন লোক বললেন, দাঁড়ন আমি ধরছি আপনাকে।

কারুর সাহায্য নিতে আমার লজ্জা করে। অথচ উপকারী মানুষের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করাও যায় না। কোনো রকমে বললাম, ঠিক আছে—

তবু তিনি আমার হাত ধরলেন। তার সঙ্গে নামতে লাগলাম। তখন একটি রিনরিনে কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আপনার বইটা? বইটা যে রয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা একটি তেইশ-চবিবশ বছরের মেয়ে, মোটামুটি সুশ্রী এবং সপ্রতিভ। বইটা বাড়িয়ে ধরেছে আমার দিকে।

আমি মুখে ধন্যবাদ না জানিয়ে শুধু কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিয়ে বইটা নিলাম। বইটা হারালে খুব মুশকিল হত, লাইব্রেরি থেকে আনা।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কে মারল?

এমনিতে এরকম একটি অচেনা যুবতী মেয়ে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলত না। আমার রক্তমাখা মুখ দেখে ওর মনে বুঝি দয়া হয়েছে।

আমি বললাম, পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই।

মেয়েটি বোধহয় এরকম কোনো উত্তর আশা করেনি। তাই আমার কথা শুনে সে একটু হেসে ফেলল হঠাৎ। রক্তাক্ত চেহারার মানুষকে দেখে কেউ হাসে না।

বাস এর আগেই চলতে শুরু করেছে। আমাকে নামতে হবে পরের স্টপে। মেয়েটির প্রশ্ন ও চিন্তা আমার মধ্যে নতুন করে সাড় জাগায়। কে আমাকে মারল? কী দোষ আমি করেছি? হঠাৎ লেগে যাবার ব্যাপারও নয়, এত জোরে লেগেছে। কেউ যদি সামনাসামনি কোনো অভিযোগ জানাত, ঝগড় করত, আচমকা মেরে বসত, তাহলেও না হয় মানে বুঝতাম। কাপুরুষের মতোই আত্মগোপন করে কেন মারল আমাকে? কোনো কাপুরুষের সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

বাসটি ততক্ষণ চলতে শুরু করেছে। যে ভদ্রলোক আমার হাত ধরে নামাচ্ছিলেন তিনি বললেন রোককে। রোককে।

বাস তবু থামল না। তিনি আরও জোর গলায় বললেন, রোককে। দেখছেন না অ্যাকসিডেন্ট।

ভদ্রলোক ব্যাপারটাকে নাটকীয় করতে চান। যন্ত্রণার মধ্যেও আমার লজ্জা হয়। আমাকে কেন্দ্র করে কোনো নাটকীয় ব্যাপার আমি পছন্দ করি না। অনেক লোক একসঙ্গে আমার দিকে তাকালে আমার শরীর কুঁকড়ে যায়।

একতলার কিছু লোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কেউই খুব একটা কৌতূহল দেখাল না। কন্ডাক্টর দুজনই নীচতলায় গল্প করছিল, তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? আমি তাদের কোনো উত্তর দিলাম না। বাস থামতেই নেমে পড়লাম।

যন্ত্রণায় তখনও আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীরের কোনো জায়গার বদলে নাকে লেগেছে বলেই ব্যথাটা এত বেশি। রক্ত বন্ধ হয়নি তখনও। আমার প্রথমেই চিন্তা হল, রক্তটা বন্ধ করা দরকার।

অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাকাছি কোনো ডাক্তারখানা নেই।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, একটু হাঁটতে পারবেন? আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে একটা ডাক্তারখানা আছে।

আমি কাছেই একটা টিউবওয়েল দেখতে পেলাম। বললাম, আগে রক্তটা ধুয়ে নিই। আমার জামায় রক্ত, রুমালটা জবজবে ভিজে , প্যান্টে, এমনকি জুতোতেও রক্তের ফোঁটা পড়েছে। এই অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না।

ভদ্রলোক পাম্প করতে লাগলেন, আমি জল দিয়ে ধুতে লাগলাম। ঠান্ডা জলের স্পর্শে খানিকটা ভালোই লাগল। যেন অজানা কারুর স্নেহের মতন। নাকের মধ্যে জলের ঝাপটা দিলেও রক্ত বন্ধ হতে চায় না।

সেই অবস্থায় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, একটু আগে বাসে দেখা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা সেই মেয়েটির কথা, যে আসলে বইটা ফেরত দিয়েছিল। মেয়েটির মুখখানা খুব চেনা মনে হয়, যদিও একথাও ঠিক, ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কারুর কারুর ক্ষেত্রে হয় এরকম—একবার দেখলেই মনে হয় অনেকদিনের চেনা। কিন্তু মেয়েটি হাসল কেন? আমার দুরবস্থা দেখে ওর কি হাসা উচিত? আমি এতই অপমানিত বোধ করলাম যে, আমার কান্না এসে গেল। তখন আমি চোখেমুখে জলের ছিটে দিচ্ছি, কেউ আমার কান্না বুঝবে না।

ভদ্রলোক বললেন, কমেছে?

আমি বললাম, অনেকটা। কিন্তু আপনি আমার জন্য কষ্ট করে নামলেন এখানে—

না, আমারও এখানেই নামবার কথা। কাছেই বাড়ি। আপনি কোথায় যাবেন?

আমি এখান থেকে থ্রি-বি বাস ধরব।

এক্ষুনি বাসে উঠতে পারবেন? শরীর দুর্বল লাগবে না?

না, চলে যাবো ঠিক।

আপনার যদি খুব তাড় না থাকে, তাহলে আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন? একটু বসে, তারপর চলে যেতেন। খুব কাছেই আমার বাড়ি।

না, না, শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করতে চাই

না। আপনি এমনিতে আমায় যা সাহায্য করলেন—।

আরে মশাই, চলুন, অত ভদ্রতা করছেন কেন! আসুন, একটু কফি খেয়ে যাবেন।

বড়ে রাস্তার অদূরে গলির মধ্যে ভদ্রলোকের বাড়ি। ইতিমধ্যে নাম জেনে নিয়েছি। ওঁর নাম অনুপম সরকার, এক সরকারি অফিসের লাইব্রেরিয়ান।

সদর দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকার, সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনুপমবাবু বললেন, একটু সাবধানে উঠবেন, আবার যেন ধাক্কাটাক্কা না লাগে।

আমি নাকের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অন্য যে জায়গায় লাগে লাগুক, আবার নাকে লাগলে আমি এবার ঠিক অজ্ঞান হয়ে যাব।

নিস্তব্ধ বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে একতলা, দোতলা, তিনতলা পার হয়ে গিয়েও অনুপমবাবু থামলেন না। আমার একটু একটু অস্বস্তি হতে লাগল। কোথায় চলেছি? এত রাত্রে একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোকের সঙ্গে এখানে না আসাই উচিত ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক-তলায়?

অনুপমবাবু আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আসুন না!

হঠাৎ আমি অন্য একটা কথা ভাবলাম। এই লোকটার মতলব কী? আসলে কোথায় নিয়ে যাবে? এই লোকটাই আসলে মারেনি তো? এখন আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছে আরও কঠিন শাস্তি দেবার জন্য?

যদিও লোকটিকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, এর সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকার কোনো কারণ নেই। তবু পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব ব্যাপার ঘটে।

আমি থমকে দাঁড়লাম। ভদ্রলোক সবলে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আরে মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন! আসুন।

গলার আওয়াজ পেয়েই বোধহয় দরজা খুলে গেল। একজন মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে, কুচকুচে কালো রং, স্নিগ্ধ মুখখানা, এক মাথা চুল। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রমহিলা প্রথমে আমাকে দেখতে পাননি, হঠাৎ দেখতে পেয়ে মুখ দিয়ে একটা আর্ত শব্দ করলেন—তারপরই ছুটে ঘরের মধ্যে কোথায় চলে গেলেন।

অনুপমবাবু হেসে আমাকে বললেন, আসুন।

আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কিন্তু এখন আর ঘরের মধ্যে না গিয়ে উপায় নেই।

বিরাট খাটের ওপর দুটি বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। ভদ্রমহিলা সেখানে নেই। ঘরে একটিমাত্র চেয়ার। অনুপমবাবু আমাকে বললেন, এই চেয়ারটায় বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসলাম। দূরে একটা ড্রেসিং ট্রেবিলের আয়নায় দেখতে পেলাম আমার চেহারা। এমন বিসদৃশ এবং বোকা ভঙ্গিতে কোনো মানুষকে বসে থাকতে আমি এর আগে দেখিনি।

একটু বাদেই মহিলা ফিরে এলেন এ ঘরে। নিজের স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলার আগেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

আমার বদলে ওঁর স্বামীই বললেন, ভদ্রলোক বাসে আসছিলেন, হঠাৎ কী যে হল, অদ্ভুত ব্যাপার—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হঠাৎ লেগে গেছে।

উনি বললেন, না। কে যেন মেরেছে।

কে মেরেছে?

তা তো জানি না।

ভদ্রমহিলা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ, মারামারি করতে নেই। মানুষের সঙ্গে মারামারি করে কী লাভ!

এতক্ষণ বাদে আমার হাসি পেল। উনি ধরেই নিয়েছেন, আমি মারামারি করেছি। এই রকমই হয় বোধহয়। এক পক্ষের আঘাতে কি রক্তপাত হয় এতটা?

আমি বললাম, না, মারামারির ব্যাপারই নয়। আমার বোধহয় ধাক্কা-টাক্কা লেগেছে কোথাও। এত রাত্রে আপনাদের খুব বিব্রত করলাম। আমি এবার চলি?

অনুপমবাবু বললেন, কি ওঁকে এই অবস্থায় যেতে দেওয়া যায়?

মহিলা বললেন, না, আজ আর যাবার দরকার নেই। আপনি আজ এখানেই থেকে যান না। কোনো রকমে জায়গা হয়ে যাবে।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, না, না, তার কোনো দরকার নেই। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

মহিলা বললেন, ঠিক আছে, একটু পরে যাবেন। এক্ষুনি ওঠবার দরকার নেই।

অনুপমবাবু আবার হাসতে হাসতে বললেন, করবী তুমি প্রথমে ওঁকে দেখেই পালিয়ে গেলে কেন? ভয় পেয়েছিলে?

অনুপমের স্ত্রীর নাম করবী। এই কথাটায় খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন কেন প্রথমে বুঝতে পারিনি। খুব নীচু করে বললেন, না, ভয় পাইনি।

এখন বুঝতে পারলাম। ভদ্রমহিলা গায়ে ব্লাউজ পরে ছিলেন না তখন। শোওয়ার জন্য তৈরি

হয়েছিলেন। অচেনা পুরুষ দেখে তাই তাড়াতাড়ি পোশাক ঠিক করতে গিয়েছিলেন।

করবীর বয়স তিরিশের কাছাকাছি। আর একবার ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল, এরকম সুন্দরী নারী আমি খুব কম দেখেছি। মুখের মধ্যে একটা কমনীয় ভাব, শান্ত দৃষ্টি, এই নারী বোধহয় পৃথিবীতে কোনো পাপের কথা জানে না।

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বেশ রহস্যময় লাগছিল গোড়া থেকে। ভদ্রলোক আমাকে ডেকে আনলেনই বা কেন, আজ তিনি আমাকে আর থাকবার জন্য পেড়াপীড়ি করলেনই বা কেন। ঘরদোরের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এদের অবস্থা সচ্ছল নয়।

করবী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাকের ওপর দুটো নখের দাগ বসে গেছে। কেউ খুব জোরে মেরেছে। ভীষণ লেগেছিল তাই না? উঃ! খুব লেগেছিল?

আমি দেখলাম, করবীর চোখে জল। আমার বিস্ময় বুকের মধ্যে আরও লাফিয়ে উঠল। উনি কাঁদছেন আমার কষ্টের কথা ভেবে! এরকম কখনও হয়?

আমি বললাম, না। ততটা লাগেনি।

করবী চোখ মুছলেন। আবার লজ্জিত মুখে বললেন, আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

আমি অসহায়ভাবে অনুপমবাবুকে বললাম, আমাকে এবার সত্যি চলে যেতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি।

অনুপমবাবু বললেন, দাঁড়ান করবীকে না বলে তো যেতে পারবেন না। ওকে এখনও চেনেননি আপনি।

প্রতি মুহূর্তেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এদের বুঝি কিছু একটা মতলব আছে আমাকে নিয়ে। যদিও তার সঙ্গে করবীর চোখের জল ফেলাটা মেলাতে পারছি না। করবী ফিরে এল এককাপ দুধ আর একবাটি গরমজল নিয়ে। দুধটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিন! অনেকখানি রক্ত বেরিয়েছে তো।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। অসম্ভব। এদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। দুটো বাচ্চা রয়েছে—এদের দুধ আমি খাব কেন? কলকাতায় এইসব পরিবারে যে অঢেল দুধ থাকে না, তা আমি জানি।

আমি কিছুতেই খাব না। ওরাও দুজন মিলে আমাকে দারুণ পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন। করবীর গলায় হুকুমের সুর। এই দুধের মধ্যে বিষ মেশানো নেই তো? কিংবা ঘুমের ওষুধ?

শেষ পর্যন্ত ওদের জোরাজুরিতে অতিষ্ঠ হয়ে রীতিমতন বিরক্ত মুখে এক চুমুকে খেয়ে ফেললাম সবটা দুধ। কোনো প্রতিক্রিয়া হল না।

করবী বললেন, এবার চুপটি করে বসুন। আমি ওই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি গরমজল দিয়ে।

আমার আর প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই। যা হয় হোক। হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইলাম চুপ করে। উনি গরমজলে তুলো ভিজিয়ে খুব যত্ন করে মুছে দিতে লাগলেন আমার ক্ষত। সস্নেহে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, লাগছে না তো! ব্যথা লাগছে না? এবার একটু ডেটল লাগিয়ে দিই? তাহলে আর ভয় নেই।

আমার মুখের খুব কাছেই করবীর মুখ। কী বড়ো দুটি চোখ, আঙুলগুলো যেন করুণা মাখা। আমার চোখ বুজে আসছিল বার বার। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ সব হচ্ছে কী? যাদের বিন্দুমাত্র চিনি না—তারা আমাকে এ রকম যত্ন করছে কেন?

করবীর অনুরোধে আমাকে জামাটাও খুলে ফেলতে হল। মেয়েদের সামনে আমি কোনোদিন জামা খুলি না—কিন্তু আমার কোনো ওজরই টিকল না। করবী সেই জামাটা বাথরুমে নিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে, আমাকে ওঁর স্বামীর একটা শার্ট পরতে দিলেন। বলতে লাগলেন, বাড়িতে ওরকম রক্তমাখা জামা পরে গেলে বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যাবে।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে করবীর সেবা নেবার পর আমি সত্যিই একসময় বিদায় নিলাম। করবী তাঁর স্বামীকে হুকুম করলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবার জন্য। অনুপমবাবু আমার শেষ আপত্তি সত্ত্বেও বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

গোড়া থেকে আমি কত রকম সন্দেহ করছিলাম, কিন্তু খারাপ কিছুই ঘটল না তো। শুধু সেবা আর যত্ন। রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা আসবার পর আমার মনে পড়ল, করবীকে সে রকম কোনো কৃতজ্ঞতা জানানো হল না তো।

অনুপমবাবুকে বললাম, আপনার স্ত্রী যা করলেন।

অনুপমবাবু বললেন, করবী বড্ড ভালো, জানেন। ওর মতন মেয়ে হয় না। নিজের স্ত্রী বলেই বলছি না।

সে তো নিশ্চয়ই।

আর একটু মিশলে দেখবেন, পৃথিবীতে এ যুগে এ রকম মেয়ে হয় না। যে-কোনো মানুষ দুঃখকষ্ট পেলে ও এত দুঃখ পায়—

সত্যি এ যুগে এরকম মেয়ে—

আমার মতন একজন গরিবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সারাদিন খাটাখাটনি করে, বাইরে বেরুতে পারে না—তবু আমার ইচ্ছে হয় কী জানেন, বাইরের লোককে ডেকে ডেকে

দেখাই। সবাইকে বলি, দেখো, এ যুগেও এরকম মেয়ে আছে। তাই আপনাকে আজ নিয়ে এলাম।

আজ রাত্তিরের সমস্ত ঘটনাটাই রহস্যময়। কেন বাসে একজন মারল? তারপর কীরকমভাবে এরকম একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। যাদের কাজ হচ্ছে, বিনা কারণে উপকার করা। সম্পূর্ণ বিপরীত এই অভিজ্ঞতা।

পরক্ষণে আবার মনে পড়ল আমার আততায়ী তো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তার জন্যই অনুপম আর করবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার লাভের পরিমাণটা অনেক বেশি। আততায়ীকে এ কথাটা জানানো দরকার।

রানি ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়লে অনেকটা বজ্রে ছায়া পড়ে। কিন্তু এখন ছায়াটা একটু বেশি লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোটো-ছোটো, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কী করে? রাত্তিরের দিকে পিছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়, অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ-ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনো আলোর খোঁজ করল—কিছুই নেই। তা হলে কী করে এতবজ্রে ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হল না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-ফাবিষ্কার যত বেশি হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলে।

ভারী ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিকশা—এমনকি ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই—যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকবার সরে সরে দাঁড়ল।

প্রজাপতিরঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না সর্দারনিরা এখনও বেরোয়নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বজ্রে হচ্ছে। কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন-টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল। এমনকি দু-একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারনি বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁট দুজন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রানি আজ স্কুলে আসেনি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রানি হয়তো এখন আর চাকরি-টাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারি করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষপর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক-মিনিট—এরপরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং, আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রানি, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙিন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ওই হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিডভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো এসব শখ বেশিদিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরাল। আগে চোখাচোখি হোক না। আধ ঘন্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ করছে? পাজ়র ছোঁজ়রা না আবার আওয়াজ দেয়। যাকগে। বাসে উঠে পড়বে না তো টপ করে।

রানি কিন্তু এদিকে তাকাল না। ছাতা না বন্ধ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। সুতরাং, অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনো কথা না বলে ওর সামনে দাঁজ়লো। বললে, চিনতে পারো?

একি, তুমি? রানি যেন খুব বেশি অবাক হয়নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। এতদিনে মনে পড়ল অভাগিনীকে? একটু দয়া-মায়া নেই শরীরে তোমার? মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে, একটা খবরও নিলে না।

সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রানি।

পাঁচ বছর আট মাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রানি কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুনছে নাকি? না, টপ করে মুখে যা এল বলে দিল। পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না, —যাকগে যাক। রানি ওর বাহু ছুঁয়ে আছে। অবিনাশেরও ইচ্ছে করল রানির কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী-ফাত্রি

বোধহয় দেখে অবাক হবে। থাক। তুমি কেমন আছ রানি?

ভালো নেই। তোমার জন্য সবসময় মন কেমন করে। বলেই রানি হেসে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমির হাসি, গোপন করতে না পেরে বলল, বিশ্বাস হল না তো? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেলল, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে!

থাক আর ইয়ার্কি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এরকম মোটা হতে হয়? কি সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বজ্জে বজ্জে—

এই, অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে। কী হবে আর এই পোড় শরীরের দিকে নজর দিয়ে। আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

কেন, স্কুলের সেক্রেটারি? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা, স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনো সংগীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

না, রানি ছদ্মম্লান গলায় বলল, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড় আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করেনি!

এটা একটা পুরোনো ঠাট্টা। রানির চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারি সুন্দর, খুব কোঁকড়নো চুল আর ফরসা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রানি এলিজাবেথের (প্রথম) মতোই দেখাত। ওর নাম আসলে প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রানি! রানি' বলে ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনোক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেত না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রানি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি? আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বজ্জে রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিৎতো হবেই! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার!'

রানি জিজ্ঞাসা করল, এখন কি চাকরি-টাকরি করছ?

কিচ্ছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার!

ফিরলে কেন?

আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?

জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কি হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

তোমার জন্য মন কেমন করছিল!

দুজনেই আবার হেসে উঠল অনেকক্ষণ। রানি বলল, জান, আমার এখন সাড়ে তিনশো—চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কি, আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না?

মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন ওই হুঁৎকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু-তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হত, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী। বুক ফেটে যেত। মনে হত, সব মেয়েই এই রকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওফ! বন্ধু-বান্ধবদের তো দেখেছি—বিয়ে করে এক একজন লেধরুস হয়ে যাচ্ছে, কীরকম বোকা বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশি বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকল বা না থাকল যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি।

কী নিষ্ঠুর, বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে! বুজ্জে হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ! নাকি আরও বেশি, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে!

এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশ বছর নয়! দু-বছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তাও কী ভয়—

সেদিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শ-খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশি চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইল দুজনেই। অবিনাশ রানির সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রানি পাশ-চোখে তা লক্ষ করে হাসে।

সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম। ইস্কুলে যখন মাস্টারনি সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক এক সময় কীরকম হাসি পায়। জীবন কাটিয়ে দেওয়া তাহলে এত সহজ! কালকে জান—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম। প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে খুক খুক করে হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কী লিখেছে জান, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা

করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।' কীরকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়', এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক'। একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

ইস! শখ কম নয়! জান চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশান পর্যন্ত দেয়নি। তার বদলে কোন আধুনিক কবির, কি জানি, তোমারই হয়তো।

কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ে না বুঝি আজকাল?

যা তা রাবিশ লিখছ তো এখন! কে পড়ে ওসব!

তোমার ইস্কুলের দু-একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না।

ফাজলামি করতে হবে না। বাড়ি যাই—

রানি, তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা ছিল।

আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

ও এবার বুঝি রাগ হল।

না রে, পাগলা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হবে না

দ্যাখ, খুকি, চালাকি করিস না। এতদিন পরে দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

অত খাতির নয়। আমার কত্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলা ধাক্কা।

তবে চল কোনো চায়ের দোকানে বসি। সত্যি একটা খুব দরকারি কথা আছে তোর সঙ্গে।

আবার তুই-তুকারি শুরু করেছিস!

তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কী নাম রেখেছিস?

তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষব, সবসময় বুকে জড়িয়ে থাকব তাকে।

রানি তোকে খুব জরুরি একটা কথা বলতে এসেছিলুম!

কোনো দরকার নেই।

সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।

না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পর। কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো আছি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বউ বউ খেলছি। তুই চাস, সব টান মেরে ফেলে দিই আবার? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি না জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে। তুই যা।

না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।

উপায় নেই যে। সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুজি শুরু করবে। এত দেরি করে তো কোনোদিন ফিরি না। ওই বাসটায় উঠি।

একটু দাঁড়। আচ্ছা মনে কর খুব ট্রাফিক-জ্যাম। বাসে ওঠার কোনোক্রমে উপায় নেই। তাহলে কী করতিস, দেরি তো হতোই।

তাহলে হেঁটে যেতাম।

আচ্ছা চল, হেঁটেই যাই। এইটুকু সময় তোকে একটা কথা বলি। এখনও শীত যায়নি, রোদ্দুরের তাত নেই।

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ করেনি যে, রানি ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত, সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে, স্বাভাবিক এবং ছোটো হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রানির ছায়ার ওপরে দাঁড়ল, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথায় পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কি। দুজনে দুজনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগল।

রানি ওর রঙিন ছাতাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে বলল, দেখি কী আছে? ঠোঁট উলটে রানি বলল, কিছুই নেই, কী আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। কটা খুচরো পয়সা আছে।

ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করব।

একসময় তো অনেক চুরি করেছ বাপু।

তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছ থেকে, রানি।

কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।

সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতিস।

ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম। এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকল, রানি?

রানি তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বলল, এবার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি? খবরদার! এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবে!

কবেই-বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা পাতলা ঘাম জমেছে। খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি অথচ একটাও চুমু খাইনি তোকে। এরকম আগে কখনও হয়েছে?

তবে আর কি, রাস্তার মধ্যে শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক।

ওই জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।

ইস, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসব টেবিলের দুপাশে।

দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হব।

শাশুড়ি থাকে।

থাকুক। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে, আমি তক্কে তক্কে থাকব।

আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলব না। কেন খুলব? তুই আমার কে?

আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠব।

কেন? তুই আমার কে?

আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে! দেখি মুখখানা।

তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস না রানি। আমি বিলেত ঘুরে এলুম হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেতফেরত।

ওরকম বিলেতফেরত গন্ডায়গন্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইমপ্রেস করতে এসেছিস! কী অধঃপতন তোর।

রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাব।

চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাব যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাঁট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

ওসব লোকফোক আমাকে দেখাসনি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুন্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাব।

নিয়ে গিয়ে কী করবি?

তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘষব।

রানি হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, এখুনি ঘষ না, এই যে দাঁড়িয়েছি, লোকে দেখুক, ক্ষতি নেই।

তারপর তোর মুখও ঘষবি, আমার পায়?

তার দরকার নেই। তোর ওই কুচ্ছিৎ পা-জোড় সবসময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

ও, তাহলে রানি সান্যাল রোমান্টিক হতে জানে।

সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী, মনে থাকে না বুঝি?

বাঃ। পরস্ত্রী। আয় না রানি, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাস্টক্লাস জিনিস।

অবৈধ প্রেমই যদি করব তবে পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন জোগাড় করতে পারি না?

করেছিস নাকি এর মধ্যেই।

অবিনাশ রানির ছাতার একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নীচে কাদা ছিল। অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়ল। অবিনাশ যে সে-দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরাল—তাতেই খুশি ছড়িয়ে পড়ল রানির মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কীসে খুশি হয় বোঝা যায় না। খুশি হয়ে রানি বলল, আজকাল এত বেশি সিগারেট খাস কেন?

তুই খাবি নাকি? আগে তো দু-একটা খেয়েছিস।

হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনেরবেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে যাই। তাহলে আর আমার বাকি থাকে কী?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখল, ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রি রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনো মানে নেই। সিগারেটে জোর টান দিয়ে অবিনাশ বলল, সত্যি রানি, আমরা অনেক দূর সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ-সাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কীরকম অদ্ভুত শোনাল, যেন একটা বিদেশি শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতিস—

থাক, পুরোনো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।

আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর আমি কোনো দুঃখের কথা বলতে আসিনি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রিজের ওপর

দিয়ে হাঁটা পথ আছে—নীচ দিয়েও আছে একটু সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নীচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়ল দুজনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেলল জলে, ব্রিজের নীচ দিয়ে ভেসে গেল। রানি একেবারে জল ভালোবাসে না। অবিনাশ রানিকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রানি এক্ষুনি ওই জলে থুতু ফেলল।

রানি বলল, এইবার শুনি কী দরকারটা? কী এমন দরকার আমার কাছে? ইস, কত বেলা হয়ে গেল যে!

অবিনাশ জানত রানি এইবার ওকথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কিরকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রানি ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বলল, কী?

তোকে একটা কথা বলব রানি। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তো তোর সেই অবিনাশই আছি।

অত ভনিতার দরকার কী? কী চাই বল না।

রানি তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও।

হুঁ। ওর খুব একা একা লাগত—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক বাজে কথা—দরকারি কথাটা কী? কী চাইতে এসেছিস এতদিন পর?

মুক্তি। এককথায় বলতে গেলে—

সে আবার কী? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি।

বন্ধনটা আর কোথায়?

সে রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিসনি। আমার মন ছাড় পেয়ে গেছে কিন্তু—

রানি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারল না। সেই জন্যই বোধহয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্নতন্ন করে খুঁজল। কোনো সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বলল, বেশ থেমে থেমে ঠান্ডা গলায়—তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটি মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর, ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পাইনি ঠিক। কেন পাইনি জানিস, সবসময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে। তোর শরীর তো আমি জানি না।

এবার বাড়ি যাই।

না, না, শোন, আমার পক্ষে খুব জরুরি কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ অর্থাৎ যা কিছু ফেমিনিন—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কী অসম্ভব উথালপাথাল করত তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সক্কলেরই যা হয় আর কী। কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুইনি, সাহস পাইনি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ওই অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। এইসব আর কী। এখন দেখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে, প্রেম-ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ডকারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে। তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে—ওদের কোনোদিন বলব না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখন—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনও পাইনি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত-কিই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে, আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি। তুই নিশ্চয়ই আশা করিসনি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব।

বয়ে গেছে আমার মনে করতে। যাক, এ সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কি। আমি কী করব?

তুই বুঝতে পারছিস না রানি? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

কীরকম সাহায্য? আমার কাছে কী চাইছিস?

একটি দিন।

তার মানে?

আমি তোর সঙ্গে একবার—

তাতে কী লাভ হবে?

আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুই-ও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনো আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাব। তার বেশি আর

কিছু পাবার নেই।

রানি হঠাৎ চোখ দুটো খুব নীচু করল। যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে। কপালের নীচে আর কিছু নেই, সাদা। সেইরকম ভাবেই বলল, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল। একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রানির কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, একি রানি, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলিনি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দুজনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রানি ফুঁসে উঠে বলল, না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ!

এটা তো ছেলেমানুষি! আমাদের এত বয়েস হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাব না—একি সম্ভব নাকি!

হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেব না।

ওসব কিছু না, রানি। জীবন অন্য রকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—

তারপর আমার কী হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকব না? অবি, তোকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাইনি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীরই মতো—তাহলে আর আমার জীবনে কি রইল? তোকে দেখলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠল। যদি দেখি,—তুইও তাহলে, আমার এই চাকরি-করা, স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ-করা সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কী থাকবে তা হলে? আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না? একজনের কাছে অন্তত রানি হয়ে থাকব না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।

কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কী কী প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিত।

তুই আর আমার সামনে আসিস না। কোনোদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তাহলেই তোকে আমি চিরকাল ভালোবাসতে পারব।

তুই ভুল করছিস। ওকে ভালোবাসা বলে না। কী দরকার ভালোবাসার। ভালোবাসা ছাড়ও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বজ্রে কথা হল জানা। যদি তোকে—

আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন শান্তভাবে কথা বলছে রানি! কিন্তু ওর মুখের একটি সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রু□দ্ধ বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রানি কেন এমন রাগ করল। রানির ওপর জোর ছিল কত। কত হুকুম করেছে একসময়। ওর কথায় রানি একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—অবিনাশ বললে, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রানি। অনেক ভেবেচিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি, কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয়নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকব। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখল রানি চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরল না, যেন ও একাই চলে যাবে। কী ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানাল রানিকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ও আর একটা সিগারেট ধরাল। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করল। সত্যি সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রানির কথা তো নয়, সম্পূর্ণ সাদা মন ও নীচের ময়লা জলের স্রোত দেখল। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখল অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রানির জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, আমি কি রানিকে অপমান করলাম? আমি তো মোটেই চাইনি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে, রানি ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেক বাদে রানিকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

মনীষার দুই প্রেমিক

আমি মনীষাকে ভালোবাসি। মনীষা আমাকে ভালোবাসে না। মনীষা অমলকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল

সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে —আমি তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড়ো হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করব।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারি পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানলার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটরগাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকূট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচব এমন আশা ছিল না তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি এসব আমি কী ভাবছি! আমি কি গর্ব করব না এ নিয়ে? ভ্যাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজিপেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ অমল নীলিমার বুক চিরে রূপালি বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুল কিংবা সাওপাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়ল সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়লাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমল, গাড়ি-ঘোড় অচল হল, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দুজন সখির সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয়নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজব!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হল হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখি দুজন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দুজনে। মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়ল। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মতো নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল-কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়লছানা—এসবের মধ্যে থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কী করে? বেড়তে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দুদিনের জন্য বেড়তে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সবকিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়য়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বলে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরব কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নীচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফরসা পেট আমার চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল! বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কখনও ঠান্ডা লাগে না।

তুমি তাকাও তো আমার দিকে! তোমাকে ভালো করে দেখি।

ভালো করে দেখবেন? আমি পাগল না আপনি পাগল?

তাহলে দুজনেই।

মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজি নই! একথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নীচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালির শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়নো ডানার মতো ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশার আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কী করে ওকে আরও খুশি করব—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আমি বোধহয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম!

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বলল, দেখুন দেখুন, কীরকম ঢেউ দিচ্ছে ঠিক নদীর মতন।

তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরির দুখানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

কেন, তুমি রিসার্চ করবে না?

ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?

তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখল, একটু হাসল, হাসি মিশিয়েই বলল, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী।

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ির পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ওইরকম অহংকার দেখতে ভালোবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে ন-টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নীচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধবধবে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দুপাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয়নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিন নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লি থেকে কয়েকদিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কীরকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হালকা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগাননি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ওই বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দুজনকে দেখছিলাম—আমরা দুজনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দুজনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়ব পড়ব—অথচ খসেনি, কী এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনও অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখব।

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজপোশাক, কোথাও বেড়তে যাবে বুঝি?

হুঁ।

কোথায়?

ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পৌঁছল, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হল—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বলল, কি ভালো আছেন?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বলল, আরেঃ আপনি? আপনি ব্যাংকক গিয়েছিলেন না? কবে ফিরলেন?

কাল সন্ধেবেলা?

পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন?

অমল সংযতভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?

একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায়নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকিনি কেন? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেত—অমলের সঙ্গে যেত না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তোমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকিনি কেন? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনও পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়য়, অমলকে সরে যেতে হবে না।

ওদের দুজনকে বড়ে সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ! চেহারাই কি সব নাকি? আমি একটু বেশি রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে না?

জি এম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করোনি, সন্ধেগুলো কাটাও কী করে?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কী আর করব, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

সে কি হে? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়ংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট।

স্যার, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

শোনো, দিল্লি অফিস থেকে মি. চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্র্যান্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মি. চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ওকে নিয়ে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

নাইট লাইফ মানে?

সে আমি কী বলব? তোমরা ইয়ংম্যান যা ভালো বুঝবে! চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে।

স্যার আমি পারবো না। অন্য কাউকে এ ভার দিন।

সেকি পারবে না কি? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবি তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

পারবে না? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজি উচ্চারণটা ভালো নয়—

সন্ধের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও নাও তাড়তাড়ি, আটটায় ডিনার।

কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাব না কিন্তু।

—বাজে বোকা না! তোমারই ভালোর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশি করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেব—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু...

আমাকে ছেড়ে দিন! আমি পারব না।

—শুধু শুধু দেরি করছো! চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড়ে কর্তাদের খুশি করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের...

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পালটে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হল। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নীচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হল, আমি মনীষার যোগ্য নই। ...আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নীচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং ঠোঁট একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজিতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেজ়তে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ওই যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারো দিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয়নি, কিংবা মনীষা আমাকে খুঁজে পায়নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়ল ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কী সুন্দর ওই পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধূলিমলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না! মনে হল, মনীষার ওই পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাব!

মনীষা হাসল, অবাক হল এবং অভিমানের সুরে বলল, যান, আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না!

কেন? আমি কী দোষ করেছি?

আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? আমার সঙ্গে চলো—

এখন? ক-টা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তাহলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারল না, একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক না একথা বলার পর কী ফল হয়। কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছ। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়, ওরা দুজন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস, ওদের দুজনকে কী সুন্দর মানায়—শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টনটন করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁতে চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না... না—! আমার ছোটো ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়তে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিশ ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দো বছরের টাপু এত ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নীচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি—এবার দুজনেই পড়বো—তিন তলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে—প্রাণ ভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হল টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—টাপু আমাকে টানছে, জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম—সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরল—টাপুকেও টেনে তুলল। ঝড়ে বেগে ছুটে এসে মা টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন-চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল। কিন্তু ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপুকে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছেলাম। এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশির ভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেশির ভাগ মানুষই তাই করত। আমি বেশির ভাগ মানুষের দলে। এইসব স্বার্থপর বর্ণকালা, অন্ধ মানুষ কেউই প্রেমিক হতে পারে না! নাঃ আমি মনীষার যোগ্য নই,

সত্যিই। অমল মনীষাকে তুমি নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়চ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করব না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনও ওকে এমনভাবে ডাকিনি। মনি, তুমি আগামীকাল ঠিক ছটার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও!

মনীষা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল আসব আসব, ঠিক আসব, কেন কী ব্যাপার?

দেখা হলে বলব, কালই দেখা করা চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেইল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা একটু কেঁপে উঠল। একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু একটুক্ষণ ভাবল কিছু? দু-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বলল, বলছি তো যাব? আপনি একটা পাগল!

কাল এল। অফিস যাইনি। অফিস গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠল অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা সার্থক। আমি সরে গেলাম সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এল সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দুজনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রিক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশি সিনেমা দেখি! সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কী সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হল কী করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু, মদ খেয়েছে, তা খাক না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কত দেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হল কী করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বজ্জেলোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বজ্জে বজ্জে হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়জড়ি করে দুজনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠল। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুলল, অবনীশের শয়তানি কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেসোমশাই হন। আমি আপনার এই বেআইনি জুয়োর আড্ডা এক্ষুনি ধরিয়ে দিতে পারি। লোকাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়তে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করব না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছায়াও মাড়বেন না। সে এখানে আসতে চাইলেই তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজি?

অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আচ্ছা রাজি। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনও বাজার করতে যাই না। দু-একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হল। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হল। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমল নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজার করা টাইপ ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবং বেশ মজা লাগল। অলক্ষে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কী একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে

গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বলল, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেব। অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না! তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক। যাক হয়তো অমল বেশি রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়লুম মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকাল, চেনার ভাব দেখাল না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বলল, বুঝলাম তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারিওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটোখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য অমলের তো এসবের অভ্যেস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইশ তরকারিওয়ালা উলটে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসত!

অন্ধ ভিখারিকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশি আছে যে অমলের ছোটোখাটো দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারিনি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নীচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হল দুপুরবেলা। মি. চোপরা দিল্লি ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বজ্রে ভিড় চোখে পড়ল। একটা মোটরগাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কীরকম সন্দেহ হল—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ওই তো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মতো দেখা যাচ্ছে। পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কী সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোককে রোককে। ঘ্যাচ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে কী যেন বলল। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটা যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজপোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে, এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়েনি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পজ়র মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বলল, যার ছাগল সে সামলাতে পারেনি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বলল, অত তেজ দেখাবেন না, মোটরগাড়ি আছে বলে ভারী ফুটানি ... দে না শালাকে দু-ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেজ়য়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটারই দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুনি বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয়ই অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করব। আমাকে না-চেনার ভান করলে কী হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাজ়র লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বলল, কেন দাম দেব কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

ইঃ উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

ক্যারদানি কত! পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিনরাত্তির জ্ঞান নেই! আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম? ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বলল, একশো টাকা।

অমল বলল, একশো টাকা! একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসাতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বলল, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে! শুরু হয়েছে গালাগালি, এসব সময়ে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বলল, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের মধ্যে দু-তিনজন লোক একসঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর ধর।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হইচই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরল। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দুবার শুধু অমল, অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না! এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করব কী করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তাহলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

মঞ্জরী

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি সেই কতক্ষণ ধরে। কখন বাস আসবে তার ঠিক নেই। এতক্ষণে মাত্র একটা বাস এসেছিল, তাতে এত ভিড় যে পা রাখাও অসম্ভব। আমি হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে পারি না। অথচ বাসে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই এখন। মধ্য কলকাতার বিকেলবেলায় ট্যাক্সি পাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার, ট্যাক্সি পাওয়ার চেয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ।

বিরক্ত হয়ে ভাবছি শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাবো কিনা, হঠাৎ এই সময়ে রাস্তার ওপারের একটা বইয়ের দোকান থেকে মঞ্জরী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। আশ্চর্য, মঞ্জরী এতক্ষণ আমার এত কাছাকাছি ছিল আর আমি শুধু শুধু বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছি! ওই দোকানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কয়েকবার, বেশ ভিড়, দু-একটি মেয়ের পিঠ দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তেমন মনোযোগ দিইনি।

এক এক সময় মনে হয়, পৃথিবীতে কোনো ময়লা নেই, দুর্গন্ধ নেই, ঘাম নেই। কোথাও মানুষকে মানুষ মারছে না। মোলায়েম স্নিগ্ধ হাওয়ায় পৃথিবীটা ভরে গেছে। মঞ্জরীকে দেখলে আমার এই রকম হয়। একথাও স্বীকার করতে লজ্জা নেই মঞ্জরীকে দেখলে আমার বুক কাঁপে! কেন কাঁপে? পৃথিবীর কোনো বিশেষজ্ঞ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

মঞ্জরী আমাকে এখনও দেখতে পায়নি। ডাকবো? মঞ্জরীর সঙ্গে আর একটি মেয়ে রয়েছে, তাকে চিনি না। যাই হোক, আমার আর এখন বাসে ওঠবার তাড় নেই, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল তাও ভুলে গেছি।

মঞ্জরী তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলায় খুব মগ্ন হয়ে আছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা উলটোদিকের ফুটপাথ ধরেই হাঁটতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমার দৃষ্টির আড়লে চলে যাবে।

রাস্তা না পেরিয়ে আমিও এ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। এরকম করার যে কি মানে হয় কে জানে? আমি কি এক্ষুনি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে মঞ্জরীর নাম ধরে ডাকতে পারি না? সেটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু এই রাস্তাটা যেন একটা নদী, আমরা দুজনে দুদিকে রয়েছি, পার হবার উপায় নেই।

একটা ট্যাক্সি দারুণ শব্দে ব্রেক কষলো। একটি ছেলে প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল, একটুর জন্য বেঁচে গেছে। বেঁচে গেল ট্যাক্সিড্রাইভারটিও। সেই শব্দে রাস্তার সব লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাকিয়েছে সেইদিকে, মঞ্জরীরাও। এবারও মঞ্জরী আমাকে দেখতে পেল না। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, এই মঞ্জরী—

মনে মনে আমি দেখতে চাইছিলাম, মঞ্জরীই রাস্তা পেরিয়ে আসে কিনা, কিংবা আমাকে যেতে বলবে ওদিকে। যেন ওর ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করছে। মঞ্জরী আমার ডাক শুনতে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে হাসি ঝলমল করে তুলল মুখখানা। আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে ডাকলো না, মঞ্জরীই সেই মেয়েটির সঙ্গে চলে এল রাস্তার এদিকে।

যাক, একটা ব্যাপার চুকে গেল।

মঞ্জরী এসে বলল, এই সুনীলদা, এদিকে

কোথায় যাচ্ছেন?

মঞ্জরীকে দেখার পর আমার আর কোথাও যাবার থাকে না, কোনো কাজের কথাই মনে থাকে না, কিন্তু মুখে সে কথা বলা যায় না। আমি একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বললুম, এই এদিকে এসেছিলাম একটু বিশেষ কাজে। তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

বই কিনতে এসেছিলাম। একে চেনেন, এর নাম সর্বাণী। আপনাদের বাড়ির কাছেই থাকে।

মঞ্জরী দেখতে সুন্দর, বড্ড বেশি সুন্দর—এত সুন্দর যে একটু ভয় করে। কেননা, কোনো সুন্দর জিনিসই পৃথিবীতে বেশিদিন থাকে না। সর্বাণী মেয়েটি সাদামাটা, দেখতে খারাপ নয়, তবে কেউ সুন্দরীও বলবে না। অন্তত মঞ্জরীর পাশে দাঁড়লে। সর্বাণী বোধহয় একটু বেশি লাজুক। আমাকে দেখে ছোট্ট একটু নমস্কার করলো।

আমি মঞ্জরীকে বললাম, বাড়ি ফিরবে কী করে? এখন তো বাসে-ট্রামে উঠতে পারবে না। একটা মিছিল বেরিয়েছে, তাই ট্রাফিক জ্যাম।

মঞ্জরী হাসতে হাসতে বলল, আমি বাড়ি ফিরবো না।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

কোথাও একটু গেলেই হয়। এখনও ঠিক করিনি।

এখন, এই মুহূর্তে সর্বাণীর উচিত বিদায় নেওয়া। আমাদের দুজনকে আলাদা থাকতে দেওয়া। এখন মঞ্জরী বাড়ি যাবে না, আমারও কোথাও যাবার নেই, আমরা পৃথিবীর শেষ সীমান্তে যেতে পারি।

মঞ্জরী অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, সুনীলদা, আপনি একটু সর্বাণীকে পৌঁছে দিন না। ও তো আপনার বাড়ির দিকেই।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তো এখন বাড়ি ফিরবো না।

কেন ফিরবেন না? না হয় আমার কথা শুনেই একটু ফিরুন। সর্বাণী যদি বাসে উঠতে না পারে—আপনার উচিত নয় ওকে পৌঁছে দেওয়া?

সর্বাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না, না, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। আমি ঠিক যেতে পারবো।

মঞ্জরী রীতিমতন ধমক দিয়ে বলল, না, তুই দাঁড়। সুনীলদা তোকে পৌঁছে দেবে।

আমি বললাম, তা না হয় পৌঁছে দেবো, কিন্তু তোমাকে রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে যাবো নাকি? তুমি কোথায় যাবে?

মঞ্জরী কি বুঝতে পারছে না, আমি শুধু ওর সঙ্গে যাবার জন্যই ব্যাকুল। কতদিন নিরালায় ওর সামনে মুখোমুখি বসে কথা বলিনি!

মঞ্জরী খুব দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে বলল, আপনি কি ভাবছেন আমি নিরুদ্দেশে যাচ্ছি নাকি?

তুমি যে বললে বাড়ি ফিরবে না? সন্ধের পর বেশিক্ষণ তো তোমায় বাইরে থাকতে দেখিনি!

বাড়িতে তো ফিরবোই না! এই তো কাছে, আমহার্স্ট স্ট্রিটে আমার মামার বাড়ি।

কদিন ধরে ওখানেই আছি।

বাঃ। তাহলে তো খুবই ভালো হল। চলো, কোথাও বসে একটু চা খাই। কিংবা, কফি হাউসে যাবে?

এখন? ইমপসিবল! আমাকে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

প্রথমবার যদি রাজি না হয়, তাহলে হাজার অনুরোধ করলেও মঞ্জরীকে আর রাজি করানো যাবে না, আমি জানি। আমিও গম্ভীরভাবে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে চলি—

একি, আপনি যে বললেন সর্বাণীকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?

আমি সত্যি এখন বাড়ি ফিরবো না, আমার অনেক দেরি আছে।

সর্বাণী রীতিমতন লজ্জা পেয়ে বলতে লাগল, সত্যি কোনো দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারবো, রোজ যাই—

মঞ্জরী আমার চোখে চোখ রেখে বলল, সুনীলদা, প্লিজ আজ ওকে পৌঁছে দিন।

আমার একটা কথা রাখবেন না?

মঞ্জরী আমার কোনো কথা রাখবে না, কিন্তু ওর কথা আমাকে রাখতেই হবে।

এই ওর জোর। এই জোর ওকোথা থেকে পেল কে জানে। কিন্তু আমিও তো অগ্রাহ্য করতে পারি না।

সর্বাণীকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিলাম ঠিকই, কিন্তু সারা রাস্তা সে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলল না। বলবেই বা কেন?

মঞ্জরীর সঙ্গে আবার একদিন দেখা হল রমেনের বাড়িতে। রমেনের বোনের বিয়ে ছিল সেদিন। একগাদা ভিড় ঠেলে এসে মঞ্জরী আমাকে বলল, সুনীলদা, আপনাকে আমি ভীষণ খুঁজছি। আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার।

লাল রঙের বেনারসিতে মঞ্জরী একেবারে রাজেন্দ্রাণীর মতন সেজেছে। তার মুখেও একটা লালচে আভা। আমি বললুম, উঃ কী দারুণ সেজেছো—আজ তোমারই বিয়ে কি না

বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশংসায় লজ্জা পায় না মঞ্জরী। ছেলেমানুষের মতন খুশি হয়। বললো, আমি ঠিক জানতুম, আপনি প্রশংসা করবেন। আপনার কথা ভেবেই তো এরকম সাজলুম।

সত্যি!

সত্যি না তো কি মিথ্যে কথা বলছি!

আমার তো আজ এখানে আসবার কথাই ছিল না। আমার আজ জামসেদপুরে যাবার কথা—নেহাৎ ট্রেন বন্ধ—

আমি ঠিক জানতুম, আপনি আসবেন!

এসব প্রেমের কথা নয়। ইয়ার্কির কথা। মঞ্জরী এরকম বলতে ভালোবাসে। আমিও শুনতে ভালোবাসি। আশেপাশের লোকদের অগ্রাহ্য করে বললো, আপনাকে আমি কদিন ধরে যা খুঁজছি না! এত দরকার আপনার সঙ্গে।

কোথায় কোথায় খুঁজলে বলো তো?

সব জায়গায়! কোথাও আপনাকে পাওয়া যায় না! কোথায় থাকেন সারাদিন?

আমার বাড়িতে একবারও খোঁজ করেছিলে? একজন মানুষকে পাওয়ার সবচেয়ে সোজা উপায় তো তার বাড়িতে—

আপনি একবার আমার খোঁজ নিতে পারেন না?

তুমি তো সব সময়ই ব্যস্ত। কত তোমার অ্যাডমায়ারার! যাকগে আমার সঙ্গে কী দারুণ দরকারি কথা আছে বলছিলে?

আমার ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ডটা হারিয়ে গেছে। কি করে রিনিউ করতে হয় আমি জানি না। আপনি একটু করে দেবেন?

আমি একটু দমে গেলাম। একটু কেন, বেশ খানিকটা। এই দরকার!

খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, এইজন্য? একি আর কেউ করে দিতে পারত না?

এটা তো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়?

আপনি ছাড় আর কেউ পারবে না।

এইজন্যই বুঝি আমাকে তোমার মনে পড়ে?

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে অদ্ভুতভাবে হাসল মঞ্জরী। এ মেয়েকে ঠিক ছলনাময়ীও বলা যায় না। মঞ্জরী শুধু মঞ্জরীর মতন। ওকে একটু আঘাত দেবার জন্য আমি বললাম, আজকাল আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বেশি যাই না। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। অন্য কারুকে বলো।

গাঢ় অবিশ্বাসের চোখে মঞ্জরী আমার দিকে তাকালো, একটু ম্লান হয়ে বলল, আপনি আমার জন্য একটু করে দেবেন না? কার্ডটা হারাবার পর থেকেই আপনার কথা ভেবে রেখেছি।

আচ্ছা, আচ্ছা, দেবোখন। আমাকে দেখলেই তোমার শুধু কাজের কথা মনে পড়ে। আমি যে তোমার জন্য অত দূরে যাবো—তার জন্য আমাকে তুমি কী দেবে?

মঞ্জরী আমার বাহুতে ওর হাত ছুঁইয়ে বলল, আপনি কী চান বলুন?

আমি কেন চাইব? তুমি নিজে থেকে বুঝি দিতে পারো না?

আপনি না চাইলে আমি বুঝব কী করে? বলুন, আপনি কী চান?

যা চাইব, তাই-ই দেবে।

চেষ্টা করব।

আমার বাহুতে মঞ্জরীর হাত, আমি চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝর্নার জলের মতন ঝকঝকে মুখ, ওর দৃষ্টিতে কোনো মালিন্য নেই। আমি আর কী চাইব? দেবীমূর্তির সামনে বসে স্বামী বিবেকানন্দও কিছু চাইতে পারেননি। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, এর দিকে তাকিয়ে থাকলে বুক শিরশির করে, কিন্তু এই সৌন্দর্য কখনও সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। গাছ থেকে ছেঁড়ার পরের মুহূর্তেই ফুল আর সেই ফুল থাকে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না, কিছু চাই না।

সেইজন্য তো আপনাকে এত ভালো লাগে। আপনি কিছু চান না।

আর সবাই বুঝি চায়?

আপনি বুঝি জানেন না? পৃথিবীতে সবাই তো সব সময় হাত বাড়িয়ে বলছে, দাও, দাও, আরও দাও—

আমি সে কথা বলিনি! তোমার কাছে অন্যরা অনেক কিছু চায়?

মঞ্জরী আমার হাতের ওপর ছোট্ট একটা চড় মেরে বলল, ধ্যাৎ!

মঞ্জরী এই পৃথিবীতে এসে অনেক কিছু পেয়েছে। জন্মেছে সচ্ছল পরিবারে, গা ভরা রূপ ও স্বাস্থ্য—সেই সঙ্গে ওর মালিন্যহীন প্রাণশক্তি। সুঠাম সুবেশ যুবকরা মঞ্জরীর চারপাশে তো ঘুরঘুর করবেই। মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করার বেশি সুযোগ আমার হয় না। কখনো-কখনো খুব ইচ্ছে হয়, কোথাও নিরালায় মঞ্জরীকে নিয়ে বসে থাকি—আর কোনো চোখ সেখানে উঁকি দেবে না—আমি মঞ্জরীকে একটু ছুঁয়ে দেখবো। ওই রূপ, ওই সৌন্দর্যের বিভা সব সময় মনের মধ্যে ছায়া ফেলে থাকে। অবশ্য মঞ্জরীর সঙ্গে সেরকমভাবে দেখা হয় খুব কমই। মঞ্জরী যখন আমাকে দেখে, কথা বলে

খুবই অন্তরঙ্গভাবে—আবার যখন দেখা হয় না তখন ভুলে যায় আমাকে।

হঠাৎ কোনো কাজের দরকার হলে মনে পড়ে আমাকে। হঠাৎ বিকেলবেলা অফিসে টেলিফোন বেজে ওঠে, তুলেই শুনতে পাই মঞ্জরীর ব্যস্ত গলা, সুনীলদা কোথায় আপনি? বারবার টেলিফোন করেও পাওয়া যায় না!

আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কতবার টেলিফোন করেছিলে?

অনেকবার! আপনি আমাকে একবার টেলিফোন করতে পারেন না?

অকারণে টেলিফোন করবো কেন?

অকারণে? আমার সঙ্গে বুঝি আপনার কথা বলতে ইচ্ছা করে না?

ইচ্ছে করলেই কি পৃথিবীতে সবকিছু হয়? আমার তো আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে। যাকগে, কীজন্য হঠাৎ তলব?

কিছুর জন্য না! এমনিই। শুনুন, আজ সন্ধেবেলা একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসতেই হবে কিন্তু!

আজই? অন্য একদিন গেলে হয় না?

না, না, আজই। কোনো কথা শুনতে চাই না, আসতে হবেই! আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

অন্য কেউ যদি পাশ থেকে শুনতো এই কথাবার্তা, তাহলে কি মনে করতো না যে আমাদের দুজনের মধ্যে গভীর টান? এমন জোর দিয়ে তো যে-কোনো মেয়ে ডাকতে পারে না। আমারও তো না গিয়ে উপায় নেই।

এবারও গিয়ে যথারীতি নিরাশ হলাম গোপনে। খুবই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার।

মঞ্জরীর এক মামা থাকেন নিউগিনিতে। তিনি একখানা মস্তবড়ে খাতা-ভরতি ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন, নিজের টাকাতেই ছাপাবেন। কিন্তু তার আগে, মঞ্জরী চায় আমি যেন সেটা আগাগোড়ে পড়ে আমার মতামত জানাই। আমি তো লেখক, তাই আমার মতামতের মূল্য আছে। তা ছাড়ে বানান ও ভাষাও ঠিক করে দিতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, সেইজন্য টেলিফোনে এত জরুরি ডাক? এটা তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেও পারতে।

কেন আপনাকে আমি ডাকতে পারি না? আপনার সময় নষ্ট হল?

তা তো হলই! তা ছাড়ে, এসব আজেবাজে লেখা আমার পড়তে ভালো লাগে না। এই রকম ঘুচিমুচি হাতের লেখা—

সুনীলদা, আমার জন্য আপনি এইটুকু কষ্ট করবেন না?

সেই অধিকারহীন দাবি জানায় মঞ্জরী। কি করে যেন জেনে গেছে, এক হিসেবে আমি ওর ক্রীতদাস। ও যদি বলে, সুনীলদা আমার জন্য আপনি সাপের মাথার মণি এনে দিন! আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবেন না?—তাহলেও আমাকে সাপের মাথার মণির জন্যই যেতে হবে।

মঞ্জরীর বিয়েতে আমি যাইনি। মঞ্জরী যখন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, আমি বাড়িতে ছিলাম না, নিজের মুখে নেমন্তন্ন জানাবার সুযোগ পায়নি। আমিও একটা ছুতো করে সেই সময়টা কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। আমার ঈর্ষা খুব প্রবল। আমার চোখের সামনে মঞ্জরীর হাতের ওপর অন্য কেউ হাত রাখবে—এটা সহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যদিও জানতাম, মঞ্জরীর একদিন তো বিয়ে হবেই কিন্তু সেই দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখার দরকার নেই। পৃথিবীতে আমার চোখের আড়লে তো কত রূপ ঝরে যায়, কত সৌন্দর্য অন্যের ভোগে লাগে, তা নিয়ে তো আর আমার মন খারাপ লাগে না।

বিয়ের পর মঞ্জরী চলে গেল বাঙ্গালোরে। ওর স্বামী ওখানে খুব একটা বড়ে কাজ করে। মঞ্জরী ওখানেই থাকবে। সুতরাং, আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে না। অফিস থেকে আমাকে সাউথ ইন্ডিয়া পাঠাতে চেয়েছিল বিশেষ কাজে, আমি কিছুতেই রাজি হলুম না যেতে। মাঝে মাঝে মঞ্জরীর খবর এর-ওর মুখে শুনতে পাই। মনে মনে ভাবি, মঞ্জরী যেন সুখে থাকে, ভালো থাকে।

এলিট সিনেমার সামনে মঞ্জরীকে দেখে সত্যি খুব চমকে গিয়েছিলাম। কবে যে কলকাতায় এসেছে, তা-ও শুনিনি। বিয়ে হয়েছে দু-বছর আগে, কিন্তু একটুও বদলায়নি চেহারা। কিংবা হয়তো বদলেছে, আমার চোখে ধরা পড়েনি। পাশে দাঁড়িয়ে ওর স্বামী, বেশ সুপুরুষ ও ভদ্র।

মঞ্জরীই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই সুনীলদা, এই তো আজ ধরেছি। আমাদের বিয়েতে যাননি কেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মঞ্জরী, তুমি কেমন আছো?

ভালো আছি।

আরও কিছুক্ষণ কথা হল। কিন্তু সেসব কথা আমি মন দিয়ে শুনিনি। একটি কথাই আমার কানে বাজতে লাগল, ভালো আছি। ভালো তো থাকবেই, দুঃখ মানায় না মঞ্জরীকে, আমিও চাই মঞ্জরী ভালো থাকুক। কিন্তু আমাকে আর দরকার নেই মঞ্জরীর। এবার আর বলল না, একটা দারুণ দরকারে আপনাকে খুঁজছি।

আর বলবে না, আমার জন্য এইটুকু কষ্ট করবেন না?

যে-কথার উত্তরে আমি বলতে পারতাম, তার বদলে আমাকে কী দেবে তুমি?

আপনি কী চান বলুন?

আমি কিচ্ছু চাই না।

এসব কথা আর বলা হবে না। বুকের মধ্যে সরু সুতোর মতন একটা ব্যস্ততা ঘুরে বেড়য়। বিদায় নেবার আগে মঞ্জরী বলল, সুনীলদা, আপনার খবর-টবর সব ভালো তো? ভালো আছেন তো?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

নীরার অসুখ

ডালহৌসি স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি, হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীতে কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কীসের যেন একটা শোরগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম দূরাগত একটা মিছিল। এ পাড় থেকে কি একশো চুয়াল্লিশ ধারা উঠে গেছে? সারাবছরই তো থাকে। উঠে যায়নি। অবিলম্বে পুলিশ এসে মিছিলের গতি রোধ করল। উত্তেজনা ও গোলমাল বাড়ল। তারপরই হুজ্জেহুড়ি। লোকজন ছুটোছুটি করছে চারদিকে। ঠিক যেন ভিড়ের মধ্যে একটা পাগলা ষাঁড়কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধাবমান লোকগুলির কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই।

আমি গড্ডলিকা প্রবাহে গা না মিশিয়ে প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়লাম। কলেজজীবন থেকেই পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার-গ্যাস চালানো এত বেশিবার দেখেছি যে এইসব গোলমালের চরিত্র বুঝতে আমার ভুল হয় না। লাঠি টিয়ার-গ্যাসের অবস্থায় এখনো আসেনি।

লোকজনের ছুটোছুটি ক্রমশ বাড়ছিল। তার ফলে লেগে গেল একটা বিশ্রী ট্রাফিক জ্যাম। কতক্ষণে এর জট ছাড়বে কে জানে। এর ওপর আবার আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেল বৃষ্টি। রীতিমতন জোরে।

বৃষ্টি আসার ফলে লোকজনের ছুটোছুটি, মিছিল ও পুলিশের তাণ্ডব সবই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। বর্ষার তেজি বৃষ্টি অন্য কিছু সহ্য করে না। কয়েক মিনিট পরে আর সব কিছুই শান্ত, শুধু বৃষ্টিরই প্রবল প্রতাপ দেখা গেল।

আমি তখন আমার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম! যতদূর সম্ভব অন্যান্য গাড়ি-বারান্দাগুলোর তলা দিয়ে যাওয়া যায়। পুরোটা রাস্তায় সেরকম সুযোগ নেই, বেশ ভিজতে হল আমাকে। বুক পকেটটা শুধু চেপে রইলাম সিগারেট দেশলাই আর সামান্য যা টাকাপয়সা আছে তা যেন না ভেজে।

বেশিদূর নয়, আমার যাবার কথা রাজভবনের পশ্চিমদিকের গেটের সামনে। নীরা ওখানে আসবে, ঠিক সাড়ে চারটের সময়। আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে।

সিংহমূর্তির কাছেই একটা গাছতলায় দাঁড়লাম। নীরা এখনো আসেনি। নীরা কোনোদিন দেরি করে না।

কিন্তু সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বিরাট গাড়ির লাইন পড়েছে। ট্রাফিক জ্যাম ছড়িয়ে পড়েছে এদিকেও। এর মধ্যে নীরা আসবে কী করে? ট্রাম বাস সব অচল। নীরা যদি ট্যাক্সি নিয়েও থাকে, তবু এই জ্যাম ভেদ করে ট্যাক্সি আসতে পারবে না। ওরা আসতেও চায় না।

ভীষণ রাগ হল আমার। ঠিক এই সময়ে কি ট্রাফিক জ্যাম না হলে চলছিল না? এদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই।

বৃষ্টির সময় গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া খুব সুবিধের ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম জলের হাত থেকে বাঁচা যায়। তারপর গাছ নিজেই মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝাড়তে থাকে।

আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করলাম। সিগারেট ভেজেনি বটে কিন্তু দেশলাইটা নেতিয়ে গেছে। কয়েকটা কাঠি নিয়ে জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম বার বার। ছাল-চামড় শুধু উঠে আসে!

আমার পাশে আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজনের মাথায় ছাতা। তবু তিনি আশ্রয় নিয়েছেন গাছের নীচে। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

লোকটি আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। নিজের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

হয় ওঁর কাছে দেশলাই নেই অথবা উনি কাঠি খরচ করতে চান না।

সাবধানে ওঁর সিগারেটটা ধরে আমি আমারটা জ্বালিয়ে নিলাম। তারপর ওঁরটা ফেরত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, ধন্যবাদ।

আমার ধন্যবাদের উত্তরে উনি বললেন, ফেলে দিন।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওঁর সিগারেটটা মাত্র আধখানা পুড়েছে, উনি ফেরত নিতে চাইছেন না কেন? আমরা তো আরও অনেক দূর পর্যন্ত টানি।

আমি আবার বললাম, এই নিন।

উনি একইরকম গলায় বললেন, দরকার নেই ফেলে দিন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। আমার মুখখানা অপমানে কালি হয়ে গেল। এর মানে কি? আমি কি অচ্ছুৎ? আমার ছোঁয়া সিগারেট উনি স্পর্শ করবেন না? তাহলে দিতে গেলেন কেন? আমি তো সিগারেটের আগুন চাইনি। আর যদি ফেলতেই হয়, আমার কাছ থেকে নিয়েও তো নিজে ফেলতে পারতেন।

অথচ এই নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অভদ্র লোকদের এই একটা সুবিধে, ভদ্রলোকেরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে না। তারা নিজেরাই সহ্য করে যান। আমি মনে মনে গজরাতে লাগলুম।

পাঁচটা বেজে গেল, নীরা এখনও এল না। ট্রাফিক জ্যামের জট ছেড়ে গেছে, বৃষ্টির তেজ একটু কম। নীরা তো কোনোদিন এত দেরি করে না।

সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আর কোনো সন্দেহ নেই যে নীরা আজ আর আসতে পারবে না। নিশ্চয়ই আকস্মিক কোনো অনিবার্য কারণে আটকে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি গাছতলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু আমি কারুর কাছে দেশলাই চাইব না।

সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি, এই সময় পটাং করে আমার একটা চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। চামড়ার চটি জলে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই ছেঁড়-চটি নিয়ে আমি কী করি। রাজভবনের সামনে মুচি খুঁজে পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ছেঁড়-চটি ঘষটে ঘষটে হাঁটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার। চটি-জোড়া পুরোনো, ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু খালি পায়ে হাঁটার মতন মনের জোর নেই।

অগত্যা সেই চটি টেনে টেনেই হাঁটতে লাগলুম। অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে। চটি ছিঁড়ে গেলে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্ব চলে যায়।

খানিকটা এগোতেই কার্জনপার্কের মোড়ের কাছে দড়াম করে জোর একটা শব্দ হল। চোখ তুলে সেদিকে তাকালাম। না তাকালেই ভালো হত। একটা লরি ধাক্কা মেরেছে একটা টেম্পোকে। টেম্পো থেকে একটা লোক ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

এতকাল কলকাতায় আছি, কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনও কোনো দুর্ঘটনা দেখিনি। আজই প্রথম। আজ বিকেল থেকে পর পর একটার পর একটা খারাপ ঘটনা ঘটছে কেন? পৃথিবীর যন্ত্রপাতিতে কি কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? হঠাৎ আমার মনে হল, নীরার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ হয়েছে। সেই জন্যই আসতে পারেনি। কালকেও নীরাকে পরিপূর্ণ সুস্থ দেখেছি, আজ তার অসুখ হবার কোনো কারণই নেই। তবু আমার ওই কথাই মনে হল—সেইজন্যই আজ আমি একটার পর একটা কু-চিহ্ন দেখছি। এইসব ঘটনার সঙ্গে নীরার অসুখের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। এই জগৎ তো মায়ার প্রতিবাস, আমার মনের অবস্থা অনুযায়ীই সব কিছু ঘটে থাকে।

নীরার অসুখ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার এক্ষুনি জানা দরকার। ওদের বাড়িতে সাধারণত আমি টেলিফোন করি না, আজ করতে হবে।

কোথায় টেলিফোন? ট্রাম গুমটিতে। ছেঁড়-চটি পায়ে দিয়েই ছুটলাম সেই দিকে। তিন-চারজন আগে থেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে। মেয়েরা টেলিফোন করতে অনেক সময় লাগায়। আমার ইচ্ছে হল, এদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি করে বলি, আমাকে একটু আগে সুযোগ দিন, পৃথিবীর সমস্ত কাজের চেয়েও আমার কাজটা বেশি জরুরি।

কিন্তু এ কথা মুখে বলা যায় না। নীরস মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম সবার পেছনে। মেয়েটি যথারীতি বহুক্ষণ সময় লাগাল। ও যেন কার সঙ্গে ঝগড় করছে। তাতো করবেই। আজ এই মুহূর্তে, পৃথিবীতে কেউ সুখে নেই।

প্রায় আধঘন্টা বাদে আমার সুযোগ এল। ঠিকঠাক খুচরো পয়সা পকেটে আছে আগেই দেখে নিয়েছিলাম। কানেকশান হবার পর এনগেজড টোন পেলাম। তবু ফোন ছাড়লাম না। পর পর তিনবার চেষ্টা করলাম। একই অবস্থা। তখন টেলিফোন অফিসে লাইন ধরে জিজ্ঞেস করলাম, এই নাম্বারটার কী অবস্থা দেখুন তো। দূরভাষিণী জানালেন, ওই নাম্বার এখন আউট অব অর্ডার হয়ে আছে।

খুব একটা আশ্চর্য হবার মতন ব্যাপার কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে পর পর যা ঘটছে, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে।

এরপর আমি একটা কাজই করতে পারি। পা ঘষটে ঘষটে চলে এলাম ধর্মতলার মোড়ে। সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় মুচি পাওয়া অসম্ভব—ঈশ্বর এরকম নিয়ম করেছেন। সুতরাং, আমি আমার পুরনো চটি-জোড় ফেলে দিয়ে ফুটপাথ থেকে একজোড় রবারের চটি কিনে নিলাম। তারপর মিনিবাস ধরে দ্রুত নীরার বাড়িতে।

দরজা খুলল চাকর। কোনো দ্বিধা না করে জিজ্ঞেস করলাম, দিদিমণি আছে?

অন্য দিন হলে নীরার বাবার সঙ্গে প্রথমে কথা

বলতাম, একটা কোনো জরুরি প্রসঙ্গ বানিয়ে নিতে হত। আজ আর ওরকম অছিলা খোঁজার কোনো মানে হয় না।

চাকরটি বলল, দিদিমণি ওপরে শুয়ে আছেন।

অসুখ করেছে?

না এমনিই শুয়ে আছেন।

খবর দাও, বলো, সুনীলবাবু দেখা করতে এসেছেন। চাকরটি ওপরে চলে গেল। আমি বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলাম। বসতেও ইচ্ছে করল না। টেবিলে অনেক পত্র-পত্রিকা পড়ে আছে, ছুঁয়েও দেখলাম না।

চাকর একটু পরে এসে বললো, দিদিমণির জ্বর হয়েছে।

আমার প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আমি আগেই বলেছিলাম না?

খুব শান্তভাবে বললাম, আমি একবার ওপরে যাব। দিদিমণির বাবা কিংবা মাকে একটু বলে এসো আমার কথা।

বলেছি, আপনি আসুন।

চাকরটির আগে আগেই আমি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এলাম। নীরার ঘর আমি চিনি। তিনতলায় সিঁড়ির পাশেই।

নীরা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, গায়ে একটা পাতলা নীল চাদর, চোখ বোজা। ওর মা শিয়রের কাছে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছেন।

নীরার মা আমাকে দেখে সামান্য একটু অবাক হলেন, কথায় তা প্রকাশ করলেন না অবশ্য। বললেন, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

আমাকে বলতেই হল যে নীরার বিশেষ বন্ধু স্নিগ্ধা, যে আমার মাসতুতো বোন, সে নীরাকে একটা খবর দিতে বলেছিল, আমি এ পাড়ায় এসেছিলাম অন্য কাজে, এসে শুনলাম, নীরার অসুখ।

ওর মা বললেন, দ্যাখো দেখি, হঠাৎ কী রকম জ্বর। দুপুরেও ভালো ছিল।

কী হয়েছে?

বুঝতে পারছি না তো। টেম্পারেচার একশো ডিগ্রি।

ডাক্তার এসেছিলেন?

রথীনকে তো খবর পাঠিয়েছি। ন-টার সময় আসবে বলেছে। টেলিফোনটা আবার আজকে খারাপ। ওর বাবাও এখনও অফিস থেকে ফেরেননি।

কথাবার্তা শুনে নীরা চোখ মেলে একবার তাকাল। ঘোলাটে দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারল কি না কে জানে।

আমি চেয়ারে বসে নীরার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ওষুধ-টোষুধ আনতে হবে? আমি এনে দিতে পারি?

না। রথীন এসে দেখুক।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম , উনি কি একবারও ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন না?

আজকালকার মায়েরা তেমন অবুঝ নন। একটু বাদেই উনি বললেন, তুমি একটু বসো। আমি একটু গরম দুধ নিয়ে আসি, যদি খায়।

উনি ঘর থেকে চলে যাওয়া মাত্রই আমি উঠে গিয়ে দরজার কাছে উঁকি মেরে দেখলাম, উনি একতলার রান্নাঘরেই যাচ্ছেন কিনা। উনি তাই-ই গেলেন। তাহলে ফিরতে অন্তত দু-মিনিট তো লাগবেই।

নীরার শিয়রের কাছে এসে আমি ওর কপালে হাত দিলাম। কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।

নীরা চোখ মেলে তাকাল আবার। তারপর অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি আজ যেতে পারিনি।

ও কথা এখন থাক। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

আমার মন খারাপ লাগছে খুব।

ছিঃ এখন মন খারাপ করে না। হঠাৎ অসুখ বাধালে কী করে?

আমার তো অসুখ হয়নি, আমার মন খারাপ।

লক্ষ্মীটি এখন মন খারাপ করো না।

নীরা আমার হাতটা টেনে নিজের চোখের ওপর রাখল। আমি ভালো লাগায় বিভোর হয়ে গেলাম। আবার ভয়ও করতে লাগল। ওর মা এক্ষুনি এসে পড়বেন না তো?

নীরা বলল, তুমি যেও না।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর মা এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। উত্তেজনায় আমি কাঁপছি।

ডাক্তার না-আসা পর্যন্ত আমি বসেই রইলাম সেই ঘরে। এর আগেই নীরার বাবা এলেন, দু-চারটে কথা বললেন আমার সঙ্গে। আমি জানি, ওঁরা তো আমাকে জোর করে চলে যেতে বলবেন না।

ডাক্তার এল সাড়ে ন-টায়। ওদের কিরকম আত্মীয়। নীরার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলেন। নীরার জ্বর তখনও একটুও কমেনি। বরং বেড়েছে মনে হয়।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, তোর হঠাৎ কী হল?

নীরা বলল, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

কোথায় ব্যথা?

নীরার সেই একই উত্তর, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

ওরা কেউ জানে না, শুধু আমি জানি, নীরা কখনও অসুখের কথা আলোচনা করতে ভালোবাসে না। কোনোদিন ও শরীরের কোনো ব্যাপার নিয়েই অভিযোগ করেনি। কিংবা আমার সামনে করে না।

ডাক্তার নীরার বুক-পিঠ পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, জ্বর তো একশো পাঁচের কম নয় মনে হচ্ছে। কোনো রকম ভাইরাস ইনফেকশান মনে হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। আজ তো হবে না! কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।

তার পরদিন থেকে কলকাতা শহরে কি তুলকালাম কাণ্ড। আগের দিনের ঘটনার জেরে ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশের সঙ্গে আবার মারামারি। ট্রাম বাস পুড়ল। কলকাতা শহরটা বিকল হয়ে গেল।

আমি বিকেলে দৌড়তে দৌড়তে গেলাম নীরার কাছে। নীরার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কোনো কথা বলতে পারছে না, প্রায় অজ্ঞানের মতন অবস্থা। এদিকে রক্ত পরীক্ষার কোনো ফলাফল তখনও আসেনি।

বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এলাম নীরাদের বাড়ি থেকে। রাস্তাঘাট ফাঁকা থমথমে। যে কয়েকজন লোককে দেখা গেল, সকলের মুখ থমথমে। মাঝে মাঝে হিংস্র চেহারায় পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

আমি তো জানি, কলকাতার এই অবস্থা তো শুধু নীরার জন্যই। নীরার অসুখ ঠিক না করলে এই শহর রসাতলে যাবে।

পরদিনও নীরার ঠিক সেই একই রকম অবস্থা। ডাক্তাররা কিছু বলতে পারছেন না। আমি তীব্রভাবে মনে মনে বলতে লাগলুম, আপনারা করছেন কী? আপনারা কি কলকাতা শহরটাকে ভালোবাসেন না? ওকে সারিয়ে না তুললে যে এই শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে। হঠাৎ ভূমিকম্পে সবকিছু ভেঙে পড়তেও পারে!

সেদিন কলকাতার সাত জায়গায় ট্রামে বাসে আগুন লেগেছে, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি একটু ফাঁকা ঘর পেয়ে অচেতন নীরার কপালে হাত দিয়ে বললাম, নীরা, ভালো হয়ে ওঠ। তোমাকে ভালো হয়ে উঠতেই হবে। তুমি এতগুলো মানুষের কথা ভাব।

পরদিন কলকাতায় কারফিউ জারি হবে কিনা এরকম জল্পনাকল্পনা চলছিল, কেউ কেউ বলছে, আর্মিকে ডেকে আনা হবে। কিন্তু সেদিনই রক্ত পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল, জানা গেল ভাইরাস। ঠিক ইনজেকশন দেবার পরই নীরার জ্ঞান ফিরে এল।

এক ঘন্টা বাদে ওর মুখের রংটা দেখাল অনেক স্বাভাবিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম নীরা, এখন কেমন আছ?

নীরা সামান্য হেসে বলল, আমার মন ভালো হয়ে গেছে।

সেদিন বাইরে এসে দেখলাম, চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া বইছে। রাস্তায় অনেক বেশি লোকজন। কয়েকজন পুলিশের মুখেও হাসি।

পরদিন সকাল থেকে কলকাতা একেবারে স্বাভাবিক।

ভিতরের চোখ

অফিসের কাজে বোম্বে গিয়েছিলাম, ভাবলাম, চট করে একবার গোয়া থেকে ঘুরে আসা যাক। হাতে তিনদিন সময় আছে। পাঞ্জিমে একদিন কাটাবার পর চলে গেলাম কালাংগুটের সমুদ্রতীর দেখতে।

তখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে চতুর্দিকে অপরূপ নরম আলো। দূরে সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দৃশ্যের সৌন্দর্য এখানে একটা বিশাল মহিমা বিস্তার করেছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে বেশ ভিড়। হিপিদের বজ্রে একটা দল তো রয়েছেই, তা ছাড়া এখন ভ্রমণকারীদের মাস এবং ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা যথেষ্ট।

প্রায় বিচের ওপরেই একটা ছোট রেস্তোরাঁ। সেখানে বসবার জায়গা নেই। বালির ওপরে হুটোপুটি করছে অনেকে। কেউ কেউ এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। জল বেশ খানিকটা দূরে।

একটি পুরুষ ও একটি রমণীকে আমি পাশাপাশি জলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি তাদের পিঠের দিক। সূর্যাস্তের দিকে এগোচ্ছে বলে, বিপরীত দিক থেকে আসা আলোয় তাদের শরীর দুটি কালো রেখায় আঁকা। হাওয়ায় উড়ছে মেয়েটির আঁচল, ছেলেটির হাতে সিগারেট। মন্থর তাদের চলার ভঙ্গি।

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল। মনে হল ওই মেয়েটির হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি আমার পরিচিত।

আর একবার তাকিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। রূপাকে আমি এতদিন ধরে এতভাবে দেখেছি যে, আমার ভুল হবার কথা নয়। শুধুমাত্র পেছন দিকটা দেখে, তাও প্রায় একশো গজ দূর থেকে এবং গোধূলিকালীন ম্লান আলোয় কোনো মেয়েকে চিনতে পারার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা রইলো না।

আমি অপেক্ষা করলাম না। পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। রূপা জলের ধার থেকে এক্ষুনি ফিরে আসবে, আজ যেন আমাকে দেখতে না পায়। আমার অভিমান বজ্রে তীব্র।

তা ছাড়, রূপা হয়তো ভেবে বসতে পারে, ও ওখানে ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়তে আসবে জেনেই আমি এখানে এসেছি। মেয়েদের মন বজ্রে বিচিত্র। আমি এখনো রূপার জন্য কাতর হয়ে আছি কিংবা ওদের সুখে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছি—এরকম ভেবে বসাও বিচিত্র নয়।

আমার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে বললাম, চলো।

ট্যাক্সিওয়ালা অবাক। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য কেউ এতটাকা খরচ করে ট্যাক্সিভাড় নিয়ে কালাংগুটের বেলাভূমি দেখতে আসে না। কিন্তু প্রকৃতি আমার জন্য বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পাঞ্জিমে ফিরে ঠিক করলাম, তার পরের দিন ভোরেই বাস ধরে ফিরে যাবো বোম্বে। রূপাও নিশ্চয়ই পাঞ্জিমে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হোক, আমি চাই না।

একবার শুধু মনে হয়েছিল, যদি রূপা না হয়! আমার দিকে পিছন ফিরে থাকা একটি নারীমূর্তি, উড়ন্ত শাড়ির আঁচল—শুধু এইটুকু দেখেছি। পরক্ষণেই মনে হল, ওই মেয়েটা রূপা ছাড় আর কেউ নয়। আমি নিজের সঙ্গেই নিজে একটা বাজি ধরে ফেললাম। এবং ফিরে গেলাম পরদিন ভোরে।

রূপার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমার দেখা কলকাতা রবীন্দ্রসদনে। দেখা মানে, এবারও এক পক্ষের ব্যাপার, অর্থাৎ আমিই শুধু দেখেছি, রূপা দেখেনি।

একটা বিখ্যাত নাটক দেখতে এসেছিলাম। টিকিট হাতে নিয়ে রবীন্দ্রসদনের কাচের দরজাগুলোর সামনে এসে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, দেখলাম, ভেতরের লবিতে আরও দু-তিনজন নারী-পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রূপা। এবারও আমার দিকে পেছন ফেরা। নতুন ডিজাইনের খোঁপা, একটা ময়ূরকণ্ঠি রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে, হাতে একটা অনুষ্ঠান-পত্র, খুব গল্পে মত্ত।

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আজ চিনতে ভুল হবার কোনো প্রশ্নই নেই। বিয়ের পর সামান্য একটু শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে, আগের মতন ছিপছিপে ভাবটা আর নেই। তবু ওর হাতের একটা আঙুল শুধু দেখলেও বোধহয় আমি চিনতে পারবো।

এখন ভিতরে ঢুকলে রূপার চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই। ঠিক করলাম, একটু পরে ঢোকা যাবে। এখন গিয়ে দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চলে গেলাম ময়দানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা বাদে ঘড়ি দেখে বুঝলাম, এতক্ষণে নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন সকলেই ভিতরে ঢুকে গেছে। এখন যাওয়া যেতে পারে।

তবু আমার যেতে ইচ্ছে করলো না। মনে মনে একটা যুক্তি খাড় করলাম, নাটক শুরু হবার পরে ভিতরে ঢোকা অভদ্রতা। অন্য দর্শকদের ব্যাঘাত হয়। আসলে, একই হলঘরের মধ্যে, এক ছাদের নীচে, যেখানকার হাওয়ায় রূপার নিশ্বাসের সঙ্গে আমার নিশ্বাস মিলবে—আমি থাকতে চাইছিলাম না। আমার জীবনে রূপা নামে কেউ নেই।

অনেকক্ষণ একলা একলা ঘুরলাম ময়দানের অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ একসময় আমি ভাবলাম আমার কি মন খারাপ? আমি একা অন্ধকারে ঘুরছি কেন?

কথাটা ভেবেই আমার হাসি পেল। আড়ই বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে রূপার। এখনও সেইজন্য মন খারাপ করে করে ঘুরে বেড়বার মতন নরম প্রেমিক তো আমি নই। এমনকি এই জন্য একটা থিয়েটারে টিকিট নষ্ট করারও কোনো মানে হয় না। অথচ রূপাকে দেখলেই আমার মনে একটা দুরন্ত অভিমানবোধ জেগে ওঠে। যুক্তিহীন এই অভিমান। রূপার বিয়ের আগে আমি তো জোর করে কিছু বলিনি। রূপাকে শুধু বলেছিলাম, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। রূপা আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। আমি তো নিজেই জানি, ওর অনেক অসুবিধা ছিল। যাই হোক সেসব এখন চুকে-বুকে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোটো। কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই। আমাকে অবশ্য চাকরির জন্য প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। রূপার স্বামীও বদলির চাকরি করে শুনেছি।

কিছুদিন পরেই রূপাকে আর একবার দেখলাম। এইবার রূপাও হয়তো আমাকে দেখেছে, তাও দু-এক পলকের জন্য মাত্র।

আমার এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম হাওড় স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ভিড়, কিন্তু ব্যস্ততার কিছু ছিল না আমাদের। সিট রিজার্ভ করাই ছিল। আমি আর অসিত পাশাপাশি হাঁটছিলাম। অসিতের সঙ্গে ছোটো সুটকেস, কুলি নেওয়ারও দরকার ছিল না।

হঠাৎ একটি কামরার জানলার দিকে চোখ পড়ল। রূপা বসে আছে জানালার ঠিক পাশটিতেই। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল।

চোখের পলক পড়তে বোধহয় একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু আমি থামিনি। এগিয়ে গেলাম। রূপা কি আমাকে চিনতে পেরেছে? যদি অন্যমনস্ক থাকে তা হলে লক্ষ না করতেও পারে।

হঠাৎ রূপার দিকে আমার চোখ গেল কেন? অসিতের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলাম, কোনোদিকে তো আগে তাকাইনি। অবশ্য, মেয়েদের দিকে চোখ আপনি চলে যায়। কিন্তু রেলের এতগুলো কামরায় আর কোনো জানালার পাশে আর কোনো মেয়ে কি বসে নেই।

অসিত জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হল না?

আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, কে? ওই সামনে যিনি যাচ্ছেন লম্বা মতন?

অসিত বলল, না, ওই যে জানলায় যাকে দেখলাম।

কারুর চোখের দিকে ঠিক তাকিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। তাই সিগারেট ধরাবার ছলে মুখ নীচু করে বললাম, আমি ঠিক লক্ষ করিনি।

অসিতের সংরক্ষিত আসন সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। আমরা দু-জনে কামরায় উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়তে এখনো মিনিট পনেরো দেরি আছে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি লক্ষ করলাম, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রূপা। হাতে একটি জলের ফ্লাস্ক। চোখে কিছু একটা খোঁজার দৃষ্টি। কি আর খুঁজবে, জলের কল নিশ্চয়ই।

একটু পরে যখন ট্রেন ছাড়ল আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়লাম। ট্রেনটা চলতে লাগল আমার সামনে দিয়ে। অসিতের উদ্দেশে আমি রুমাল ওড়তে লাগলাম। আর একবার রূপার দিকে চোখ তো পড়বেই। কিন্তু সঠিক সময়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছি, এবং রুমালটা পুরে নিয়েছি পকেটে। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাবার পর আমার মনে হল, আমি এবার সত্যিই রূপাকে আমার জীবন থেকে বিদায় দিলাম।

এরপর সত্যিই আর বছর তিনেকের মধ্যে রূপার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সময়ে অনেক কিছু ম্লান হয়ে যায়। কত গাছের পাতা ঝরে পড়ে। এই চোখে পুরোনো হয়ে যায় পৃথিবী। অনেক গুরুতর মান-অভিমানও হয় অতি সামান্য।

অফিসের কাজেই গিয়েছিলাম দিল্লিতে। উঠেছি হোটেলে। সারাদিন বহু অকিঞ্চিৎকর লোকের সঙ্গে দেখা করার কাজ। অকারণ ভদ্রতার হাসি দিতে দিতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে উঠে হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, কী যেন একটা পুজোর প্যান্ডেল সেখানে। এর মধ্যেই পরিচ্ছন্ন পোশাকের অনেক নারী-পুরুষের ভিড়। দুম করে মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পুজো। আমার খেয়ালই ছিল না।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি সরস্বতী পুজোর দিন অঞ্জলি দিয়ে থাকি। সেই ছেলেবেলায় যখন নিজেরাই পুজো করতাম, তখন তো আমরা এটা মেনে চলতাম খুব। ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর নেই, শুধু এই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। চা খেলাম না। ভাবলাম, এত কাছেই যখন পুজো তখন অঞ্জলিটা দিলেই তো হয়। সরস্বতীর সঙ্গে এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। খবরের কাগজ আর ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনি ছাড় কিছু পড়ি না—তবু পুরোনো অভ্যেসটা খোঁচা মারতে লাগলো।

ধুতিটুতি নেই। প্যান্ট-শার্ট পরেই চলে গেলাম পুজো প্যান্ডেলে। এখানে কারুকেই চিনি না। তবু বাঙালিদের ব্যাপার, নিজেকে খুব একটা বহিরাগত মনে হয় না।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিচ্ছিলাম। পাশ থেকে একটা সুগন্ধ পেলাম। ফুলের নয়, কারুর চুলের অনেক কালের চেনা গন্ধ। লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে রূপা। হাতের ফুলগুলি ছুঁড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছ?

পুরোনো অভিমান-টভিমান সব মরে গেছে। আমি হাসিমুখে বললাম, ভালো।

তুমি কেমন?

রূপা বলল, চা খাওনি নিশ্চয়ই? তুমি তো অঞ্জলি দেবার আগে কিছু খেতে না।

মনে আছে!

সব মনে আছে। আমার বাড়ি কাছেই। আসবে?

এর আগে রূপাকে দেখলেই এড়িয়ে চলে গেছি। আজ এই সকালবেলার প্রসন্ন আলোয় আমার বাল্যকালের বান্ধবীকে দেখে মনের মধ্যে আর কোনো রাগ দুঃখ অনুভব করলাম না। মনে হল, এই রোদ হাওয়া ও শিশুদের কলরবের মতন সবকিছু স্বাভাবিক।

পুজো-প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী আসেননি?

না, এখনো ঘুম ভাঙেনি।

কয়েক পা নিঃশব্দে চলার পর কিছু একটা বলার জন্যই আমি বললাম, কতদিন পর দেখা। প্রায় ছ-বছর তো হবেই। কি বলো?

রূপা বলল, কেন?

এর আগে তো আরও দেখা হয়েছে।

রূপার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, কোথায়?

রূপা হাসল। বলল, কেন?

আমার বিয়ের কয়েক মাস পরেই, গোয়ার কালাংগুট বিচে তুমি ছিলে না?

চমকে উঠলাম। শুধু মাত্র পেছন দিক থেকে দেখে আমি সেই মেয়েটিই রূপা কিনা এ সম্পর্কে একটু দ্বিধা করেছিলাম। আর রূপা আমাকে কখন দেখল?

রূপা বলল, আমি ফিরে এসে তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তোমার জন্য।

আমার হাতে বেশি সময় ছিল না। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

আমি ভেবেছিলাম। পাঞ্জিমে ফিরে এসে অন্তত দেখা হবেই। ছোটো জায়গা তো। তোমাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।

আমি পরদিন ভোরেই...

তারপর রবীন্দ্রসদনে—তুমি গেট দিয়ে ঢুকছিলে।

সেদিন তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

কেন পাবো না?

তুমি অন্যদিকে ফিরে ছিলে।

মেয়েদের ভিতরে একটা আলাদা চোখ থাকে জানো না? সেই চোখ দিয়ে দেখেছিলাম। তুমি গেট ঠেলে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলে না। আমি ভাবলাম, কিছু একটা বোধহয় ফেলে এসেছো। আমি তোমার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। নাটক শুরু হয়ে গেল, তবু আমি ভিতরে ঢুকিনি, কিন্তু তুমি এলে না আর। কোনো মিথ্যে অজুহাত দিতে ইচ্ছে করল না আর। তাই চুপ করে রইলাম।

রূপা আবার বলল, তারপর একদিন হাওড় স্টেশনে, আমি জানলার ধারে বসে।

সেদিন বোধহয় তুমি আমাকে দেখতে পাওনি, না?

মৃদু গলায় বললাম, পেয়েছিলাম।

তবু তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বললে না কেন? চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে বুঝি চোখ ফিরিয়ে চলে যেতে হয়?

না, ঠিক তা নয়।

তারপর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে তোমাকে খুঁজলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম।

কেন দাঁড়িয়েছিলে রূপা? আমি ভেবেছিলাম। ওইসব সময়ে তুমি কোনোবারই আমাকে দেখতে পাওনি। তাই আমি—

রূপা খুব নরমভাবে বলল, কেন এরকম ভাবলে? আমি তোমায় না দেখে পারি?

আমি রূপার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। সত্যিই আজ কোনো রাগ আর অভিমান নেই। রূপা আজ এই সকালবেলাটার মতনই সুন্দর। আজকের সকাল শুধু আজকেরই সকাল।

রূপা আবার বলল, তুমি এক-সময় আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলে। আমি তখন পারিনি। তারপর, তোমাকে যখনই দেখেছি, গোয়ার সমুদ্রের ধারে, রবীন্দ্রসদনে, হাওড় স্টেশনে—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছি—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু তুমি আসনি।

আমি বললাম, আজ আর সে কথা বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পেরে গেছি।

সত্যি বুঝতে পেরেছো?

না হলে মনটা এমন পরিষ্কার লাগছে কেন?

জনবিরল রাস্তার বিরাট আকাশের নীচে, নরম রৌদ্রে রূপার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মনে হল, এই নারী আর আমার নয়, কিন্তু আমি কিছুই হারাইনি। সবই থেকে গেছে। অভিমান আমাকে রিক্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আমি অনুভব করতে পারি—আবার কখনও সমুদ্রবেলায় সূর্যাস্তের মুখোমুখি এই নারীকে হেঁটে যেতে না দেখলেও, সেই দৃশ্য শাশ্বত হয়ে থাকবে।

অপরেশ রমলা ও আমি

আমি প্রথমটা দেখতে পাইনি। বাসে উঠতে যাচ্ছি, একজন মহিলা নামছেন দেখে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছি। এক পায়ে চটি, ভদ্রমহিলার পায়ের দিকে তাকিয়েই আমার বুকটা একটু শিরশির করে উঠল। মনে হল, এই পা দুটি আমার হাতের মতন, বহুদিন আমি এই দুটি পা আমার হাতের মুঠোয় ধরেছি। চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলাকে পুরোপুরি দেখে বললুম, তুমি?

রমলা তখন বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমার সে বাসে ওঠা হল না। জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছ?

রমলা হেসে সামান্য ডানদিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, আপনি কেমন আছেন?

'আপনি' শুনেই বুঝলুম, রমলার পিছন পিছন যে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকটি নেমেছে, সেই

রমলার স্বামী। রমলা কোনোদিনই আমাকে অন্য লোকের সামনে তুমি বলত না। অন্য লোকের সামনে আমি ছিলাম ওর দাদার একজন বন্ধুই।

রমলার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললুম, ভালো আছেন?

অপরেশ রায় মুখে কিছু না বলে ঘাড় হেলালেন। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। অপরেশ রায়কেও আমি আগে চিনতাম কিন্তু বছর সাতেক দেখিনি, মুখ মনে ছিল না অথচ রমলার পা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম ঠিকই। এই সাত বছরে রমলার পা নিশ্চয়ই খানিকটা বদলেছে, আমারও চোখ বদলেছে নিশ্চিত, তবু মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরেছিলুম।

হঠাৎ চৌরঙ্গিতে এই শেষ বিকেলবেলায় ওদের সঙ্গে দেখা হতে আমার ভালোই লাগল। শেষ যখন দেখেছিলুম, তখন ওর চোখের দুধার বজে শুকনো ছিল, এখন পুরো মুখটাই মসৃণ হয়েছে। কী জানি এই ছয়-সাত বছর রমলা কলকাতাতেই ছিল কিনা, আমি ছিলাম না মাঝে দু-এক বছর—তবু, এর মধ্যে কোথাও একদিনের জন্যেও দেখা হয়নি। গত তিন-চার বছর একবারও ওর কথা মনেও পড়েনি বোধহয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, রমলা আমার থেকে খুব দূরে সরে যায়নি , চোখের কোণে চিকচিকে হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বেশ সরল হাস্যে বললুম—বাঃ, বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার!

অপরেশবাবু, আপনারা কোথায় আছেন এখন?

অপরেশ কোনো কথা না বলে তেমনি হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইলেন। রমলাই উত্তর দিল, আমরা এখন গড়িয়াহাটায় থাকি। ওঁর অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে।

আপনি এখন কী করছেন?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই অপরেশ বললেন, এক সেকেন্ড! তারপর স্ত্রীকে ডেকে নীচু গলায় কী যেন বলতে লাগলেন।

আমি ওদের দিকে—সস্নেহে বললে খুব ভারিক্কি শোনাবে কিন্তু, বেশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। অপরেশের পাশে রমলাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। রমলা আগে ছিল রোগা-পটকা। এখন অপরেশের সবল চেহারার পাশে ওকেও খানিকটা স্বাস্থ্যবতী হতে হয়েছে। আমি যে রমলাকে একসময় সত্যি ভালোবাসতুম তা এই মুহূর্তে আবার বুঝতে পারলুম, কারণ ওদের একসঙ্গে দেখে আমার একটুও ঈর্ষা হচ্ছে না। গ্রীষ্মকালে এক গ্লাস ঠান্ডা জল পাওয়ার মতো, ওদের দেখার পর থেকেও আমার বুকের মধ্যে যেন আস্তে আস্তে খুশি গড়িয়ে আসছে। অপরেশকে বিয়ে করে খুবই বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিল রমলা—তার বদলে আমাকে বিয়ে করলে বেচারার দুর্ভোগের সীমা থাকত না। স্বাস্থ্য কি এমন নিটোল হতে পারত? না, তার বদলে এতদিনে মুখে পড়ত ক্লান্তির ছাপ—আমিই আমার নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি, সেই জীবন আশ্রয় করে কতদিন শান্তিতে থাকতে পারত রমলা? তা ছাড় গড়িয়াহাটায় অফিস থেকে পাওয়া কোয়ার্টার—তা জোগাড় করা কোনোদিন আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সত্যি রমলা, তুমি যে সুখে আছ, এ দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে।

অপরেশ বললেন, আপনারা একটু দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আমি এক মিনিট আসছি। আমি রমলাকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় গেল তোমার স্বামী?

চুরুটের বাক্স কিনতে।

খুব চুরুট খান বুঝি?

হুঁ! আর কোনো বিশেষ নেশা নেই—কিন্তু চুরুট না হলে চলে না। সবসময় হাতে চুরুট থাকা চাই। এক এক দিন চায়ের মধ্যে চুরুটের ছাই পড়ে যায়! মশারির মধ্যে ঢুকেও—

আমি হাসতে লাগলুম। রমলা বলল, ওর বাবাও এমন চুরুট খান—

আমার মনে হল, অপরেশ বোধহয় আমাদের দুজনকে নিরালায় দু-একটা কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যই ছুতো ধরে চলে গেল। কিন্তু সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা অপরেশ আর তার বাবার চুরুট খাওয়ার নেশা নিয়েই কথা বলতে লাগলুম।

তা ছাড় আর কিই-বা বলতে পারতুম! বলা যায় কি, রমলা আমাকে তোমার মনে পড়ে? নাঃ! আমারই ওকে মনে পড়ে না—ওরই বা পড়বে কেন? কিংবা, একথাও কি বলা যায়, তোমার মনে আছে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা? তোমাদের ছাদের চিলেকোঠায়, সরস্বতী পুজোর রাত্রে তুমি বলেছিলে, তোমার বুকের বাঁ দিকটা আমার। আমি যখন খুশি দাবি করতে পারি—বুকের ওপরটা বা ভিতর যা ইচ্ছে। না, এরকম দাবি জানাবার ইচ্ছেও আর আমার মনে পড়েনি।

কোনোদিন যদি চুরুট একেবারে ফুরিয়ে যায় তখন কী করে জান? সাদা কাগজ মোটা করে পাকিয়ে—হাতে ধরে থাকে। মাঝে মাঝে কাগজটা মুখে টানার ভান করে, অন্যমনস্কভাবে অবিকল চুরুটের ছাই ঝাড়র মতো আঙুল দিয়ে টোকা দেয়। নেশাটা মুখের না হাতের... আমার...

রমলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসছিলুম। অপরেশ ফিরে এলেন এর মধ্যে। এবার অপরেশের মুখের হাসিটা আর দেখা যায় না। আমি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, কোনো বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন নাকি? নইলে, আসুন না, একটু বসে চা খাওয়া যাক। অপরেশ

বললেন, না আমার একটু তাড় আছে।

কত আর সময় লাগবে! একটু চা খেয়ে যাওয়া—

অপরেশ ভ্রূকুটি করে বলল, বাঃ, আমি থাকব কী করে? অলি মাসির বাড়ি আমি যাব বলে কথা দিয়েছি! তুমি একা গেলে কী ভাববেন ওঁরা।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আজ চলি! একদিন আসুন না বাড়িতে!

আমি আর বিশেষ জোর করলুম না! রমলার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে পরে ঘাড় ঘুরিয়ে অপরেশকে একবার নমস্কার জানালুম। অপরেশ ততক্ষণে এগুতে শুরু করেছে।

রমলা ওর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলল, অথচ ঠিকানা দিয়ে গেল না। তার মানে ওটা কথার কথা। অথবা ধরেই নিয়েছে আমি যাব না, বা যাবার দরকার নেই আমার।

কিন্তু সেই পড়ন্ত বিকেলে ওদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আমার বেশ ভালো লাগছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করি, প্রচুর হাসাহাসি হোক, অপরেশের সামনে রমলাকে দু-একটা পুরোনো কথা তুলে লজ্জা দিই—যাতে অপরেশও প্রচুর মজা পেয়ে হাসতে পারে।

ছ-সাত বছর ওদের কথা একেবারেই ভাবিনি কিন্তু সেই দেখা হওয়ার পর, একদিন আমি এক বন্ধুকে টেলিফোন করার জন্য গাইডের পাতা ওলটাতে অন্যমনস্কভাবে অপরেশ রায়ের নাম খুঁজতে লাগলুম। অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে যখন, তখন বাড়িতে ফোন থাকা খুবই স্বাভাবিক। গাইডে তিনজন অপরেশ রায়—গড়িয়াহাটের ঠিকানা যার—আমি তার নম্বর ঘোরাতে লাগলুম। এখন দুপুরবেলা—অপরেশের বাড়িতে থাকার কথা নয় যদিও।

রমলা আমাকে কখনও টেলিফোন করেনি কিন্তু গলা শুনেই আমি চিনতে পারলুম। আমি বললুম, রমলা, আমি।

ওপাশে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল, এতদিন পর তুমি হঠাৎ ফোন করলে যে?

আমায় চিনতে পারছ তো?

হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন পর!

এতদিন পর হঠাৎ সেদিন দেখা হল কিনা। তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো আছি। কিন্তু তুমি আর কোনোদিন ফোন করো না।

সে কী! রমলা, আমার তো কোনো খারাপ মতলব নেই। এমনিই তো শুধু—

না, লক্ষ্মীটি। ও তোমার জন্য এখনও কষ্ট পায়।

কে? অপরেশ? আমার জন্য? কেন?

কেন, তুমি জানো না?

আমি কী করে জানব? আমি ওর মনের কথা কী করে বুঝব?

ও ভাবে, তোমার সঙ্গে এখনও আমার লুকিয়ে দেখা হয়।

যাঃ। সাত বছরেও…

অথবা…

অথবা কী?

ও ভাবে, আমি তোমার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও কাঁদি।

সত্যি কাঁদ নাকি?

আমি টেলিফোনে অনেকখানি হাসি পাঠিয়ে দিলুম রমলার কাছে। বললুম, যতসব পাগলের কাণ্ড! অপরেশকে দেখে মনে হল বেশ বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ লোক। সে সাত বছরেও নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল না? সাত বছর আগে যা চুকে গেছে—

হ্যাঁ, চুকেই তো গেছে। কিন্তু, তুমি আর কোনোদিন ফোন করো না লক্ষ্মীটি। আমরা তো দুজনে আর কেউ কারোর নই—তবে কেন আর—

আচ্ছা, ফোন করব না আর কখনও। কিন্তু রমলা, আমার ইচ্ছে ছিল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোক—তাহলে হয়তো ওর ভুল ভেঙে যাবে। ও তো আগে সবই জানত। জানত—তুমি ইচ্ছে করেই ওকে বিয়ে করেছ—কেউ তোমাকে জোর করেনি। আমার সাধ্য ছিল না তোমাকে আঁকড়ে রাখি।

প্লিজ, নীলুদা, ওসব কথা থাক। তুমি আমাকে ভুলে যাও। আর কোনোদিন—

লাইন ছেড়ে দিল। আমি দুঃখিত হাতে কিছুক্ষণ রিসিভারটা ধরে রইলুম তবু। কড়-র-র শব্দ হতে লাগল। আমি রিসিভারটা একবার রেখেই আবার তুলে নিয়ে সেই একই নম্বর আবার ডায়াল করলুম। ওপাশ থেকে তুলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, রমলা, আবার আমি—

নীলুদা। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাও?

না, রমলা। আমায় বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে সুখী করতে চাই। আমি আর কোনোদিন তোমাকে ফোন করব না। পথে দেখা হলেও এড়িয়ে যাব। সত্যি রমলা, তোমাদের জীবনে একটুও ব্যাঘাত করার ইচ্ছা নেই আমার। ভেবেছিলুম বন্ধুর মতো একটু দেখাশোনা করে গল্প-গুজব করব। তাও দরকার নেই। কিন্তু অপরেশের কথা শুনে

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, সে বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়ে শিখেছে—কিন্তু এ কীরকম মন তার। সাত বছর আগেকার ব্যাপার সে মনে পুষে রেখেছে? সেদিন তো দেখে কিছু বুঝতে পারিনি।

ওই যে সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ইচ্ছে করে একটুক্ষণ আড়লে চলে গেল। ধরেই নিয়েছিল, তোমার সঙ্গে আমি গোপন দুঃখের কথা বলব।

গোপন দুঃখ? তা নিয়ে আবার মুখে কথা বলা যায় নাকি? কী সর্বনাশ। অপরেশ কি তোমাকে কষ্ট দেয়?

মোটেই না। নিজেই মন খারাপ করে। প্রায়ই বলে, আমি ওকে ভালোবাসি না। কারণ আমি নাকি তোমাকে ভুলতে পারি না।

ইশ, ছি ছি। আচ্ছা, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমি আর কোনোদিন তোমাদের মধ্যে আসব না। অপরেশ কোন অফিসে চাকরি করে?

কেন? তুমি জানতে চাইছ কেন?

কোনো ভয় নেই তোমার, রমলা। আমি তোমাকে আমার পুরোনো গলায় বলছি, কোনো ভয় নেই। আমাকে প্রায়ই নানা কাজে অনেক অফিসে যেতে হয়, অপরেশের অফিসের নামটা জেনে রাখি—সেখানে কোনোদিন যাব না। যাতে কোনোদিন ওর সঙ্গে হঠাৎও আর দেখা না হয়।

আলফা এক্সপোর্ট। স্টিফেন হাউসে অফিস।

আচ্ছা রমলা, আমি ছেড়ে দিচ্ছি এবার। রমলা আমরা অনেক দূরে সরে গেছি।

এতদূর থেকে কেউ কারুর দিকে হাত বাড়তে পারি না? আমার দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। যাই—আর কোনোদিন হয়তো দেখা হবে না।

নীলুদা, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ তো?

ক্ষমার কথা উঠছে কীসে? রমলা, ছেলেবেলাতে আমি যা করেছি—তার জন্য আমি কোনোরূপ অনুতাপও করি না, আবার অতৃপ্তির হাহাকারও নেই। ছেলেবেলায় যা করেছি, তা ছেলেবেলাতেই মানায়, এখন যেমন মানায়—সেই রকম ভাবেই বেঁচে আছি। কোথাও কোনো দুঃখ নেই। তুমি ভালো থেকো রমলা।

আচ্ছা!

এর পরদিন আমি যা করলুম, তার ঠিক যুক্তি হয়তো দেখাতে পারব না। আমি লোকটা তেমন খারাপ নই—স্বাভাবিক মানুষ যেমন হয়—সেই রকম। তবে, নিজের কয়েকটি ইচ্ছার আমি নিজেই যুক্তি খুঁজে পাই না। যেমন, একদিন আমি পার্কে আলুকাবলি খেয়ে বেরিয়েছি, খুব ঝালে ঠোঁট উস উস করছি—দুহাতে লঙ্কার গুঁড়ে, নুন আর ঝোল লেগে আছে—হাত মোছা হয়নি। কোথায় হাত মুছব ভাবছিলুম—পকেট থেকে রুমাল বের করে মোছা যায় কিন্তু সেই রুমাল দিয়ে ভুল করে যদি কখনও মুখ মুছতে যাই—তবে চোখের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কী করব ভাবছিলুম, সেই সময় একটি সুবেশ যুবকের দিকে আমার চোখ পড়ে। চমৎকার চেহারা, খুব দামি পোশাক পরা—পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবকটি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল, সেই যুবকটির গায়ের জামায় হাত দুটি মুছে দিই! ভাবতেই আমার হাসি পেল, এখন সোজা গিয়ে যদি ওর ফর্সা জামায় আমার হাত দুটি ঘষে দিই—কী অবস্থা হবে? যুবকটি হয়তো কোনো নারীর জন্য অপেক্ষা করছে—তাহলে ... আমার ইচ্ছাটা এমন প্রবল হল যে, আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়লুম। কিন্তু সামনা-সামনি হাতে ঘষে দেব তত সাহস আমার নেই। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা হতে লাগল। ছেলেটির চোখে কালো গগলস—সেই দেখেই কিনা, হঠাৎ আমার মনে হল, ছেলেটি আমার শত্রু, এর ওপর প্রতিশোধ নিতেই হবে—অথচ ওকে আমি কোনোদিন দেখিনি।

যুবকটি হাঁটতে শুরু করতেই আমি ওকে অনুসরণ করলুম। দশ মিনিট হাঁটল সে—আমিও ওর পিছনে পিছনে যাচ্ছি। তখন আর আমার ফেরার উপায় নেই, তাহলে আমি ওর কাছে হেরে যাব। আমার হাতের পাঞ্জা দুটি খোলা—তখনও লঙ্কা তেঁতুলের টক লেগে আছে। হাজরার মোড় থেকে ছেলেটি একটি বাসে উঠল। সেই আমার সুযোগ—আমিও বাসে উঠে পড়লুম—খুব ভিড় ছিল, ভিড় ঠেলে আমি ওর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছি এবং এক সুযোগে ওর পিঠে এঁকে দিয়েছি, আমার দু হাতের ছাপ। তারপরেই জয়ের গর্বে মন ভরে তুলতে—আমি নেমে পড়েছি বাস থেকে।

বোধহয় সেইরকম কোনো যুক্তিতে, আমার বার বার মনে হতে লাগল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করা দরকার। সে আমাকে শত্রু ভাবছে, অথচ আমি তো সত্যই তার বন্ধু। রমলাকে সে বিয়ে করে সুখী করেছে—সে আমার বন্ধু হবে না? আমি রমলাকে এক সময় পাগলের মতো ভালোবাসতুম—এখনও ভালোবাসি নিশ্চয়ই। যদি দেখতুম রমলার স্বামী একজন কুচ্ছিত গরিব লোক কিংবা মাতাল লম্পট জুয়াড়ি—তার ওপর আমি নিশ্চিত রেগে যেতুম, সে হত আমার শত্রু। কিন্তু অপরেশ অমন দৃপ্ত স্বাস্থ্যবান—সে রমলাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে—সে আমার শত্রু হবে কেন?

এতসব ভাববার আগেই কিন্তু আমি আলফা এক্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে ঢুকে পড়েছি। আলাদা ঘরের সামনে অপরেশের নাম লেখা—বেশ বড়ে অফিসারই মনে হল। বাইরের কোনো বেয়ারার হাত দিয়ে স্লিপ পাঠালে যদি অভিমানী অপরেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে না চায়, এই ভেবে আমি দরজা খুলে সোজা ঘরে ঢুকে

পড়লুম।

আমাকে দেখে অপরেশ নিশ্চিত খুবই অবাক হয়েছেন—কিন্তু অফিসাররা মুখের বিস্ময় লুকোতে জানে। ফাইলে মুখ গোঁজা ছিল, মুখ তুলে নির্বিকারভাবে বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললুম, পাশের অফিসে আমার এক বন্ধু কাজ করে, তার ওখানেই আপনার নাম শুনে ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। খুব বেশি ব্যস্ত ছিলেন নাকি!

না খুব নয়।

অপরেশ তখনও আমাকে বসতে বলেননি। সে অভিমান করে আছে। কিন্তু আমার এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে কিছু মনে করলে চলে না। আমি নিজেই চেয়ার টেনে বসলুম। বললুম, সেদিন পথে দেখা হল কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো করে কথাই হল না।

হুঁ।

এ অফিসে কতদিন আছেন?

একটা কথা আগে জিজ্ঞেস করে রাখি। আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভাইপো বা বন্ধুর ভাইয়ের জন্য চাকরির উমেদারি করতে আসেননি? এখন লোক নেওয়া হচ্ছে যদিও কিন্তু আমাদের অফিসে ওসব চলে না।

এ যে স্পষ্ট অপমান। এ কথায় আমার খুব রেগে ওঠাই উচিত ছিল বোধহয়। তবু হেসে বললুম, না আমি কারুর চাকরির জন্য আসিনি। আমার নিজের জন্যও নয়। আমি আন্তরিকভাবেই দু-একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

আমার কাছে? হঠাৎ!

আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করছেন না। তার কারণ হয়তো—

কোনোই কারণ নেই। আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিনই ভালো করে পরিচয় ছিল না—হঠাৎ অর্ধপরিচিত লোকদের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনা করা আমার স্বভাবও নয়। আমার স্ত্রীর মাকে আমি মা বলে ডাকি, তা বলে আমার স্ত্রীর সব বন্ধুদেরও আমি বন্ধু ভাবব, তার কী মানে আছে?

'স্ত্রীর বন্ধু' বলতে আপনি ঠিক কী ভাবছেন?

ঢং ঢং করে বেল টিপে অপরেশ বেয়ারাকে ডাকলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন নন ফেরাস মেটালের ফাইলটা এখনও পেলাম না কেন?

অপরেশের সঙ্গে ওর অফিসে এসে দেখা না করলেই ভালো হত—অফিসের বাইরে ছুটির পর দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত ছিল আমার। এইসব অফিসারদের ব্যবহার এমন হাস্যকর হয়—যতক্ষণ নিজের কামরায় বসে থাকে! বাইরে বেরুলেই এরা সাধারণ মানুষ কিন্তু নিজের এই পার্টিশন করা ঘরের মধ্যে টেবিলের উলটোদিকে নিজের ঘুরোনো চেয়ারে বসলেই আর কিছুতে মুখের ভাব সরল করতে পারে না। কার্টুনের মতো মুখভঙ্গি করে থাকে। অপরেশ আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, বলুন।

আমি চেয়ারটাকে টেবিলের আরও কাছে টেনে আনলুম। আমার মুখে হাসি। বললুম, আপনার সময় জরুরি। সুতরাং অল্প সময়ে স্পষ্ট করে কথা বলে যাই। সেদিন আপনাদের দেখে একটা কথা মনে হল। আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। না করুন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মনে কোনো জ্বালা রাখবেন না। রমলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল—একথা জেনেও আপনি ওকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলেবেলায় এরকম বন্ধুত্ব অনেকেরই থাকে—আপনারও হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে ছিল। বিয়ের পর আর ওসব কে মনে রাখে? রমলাকে আমার মনেও পড়ে না।

আপনি এসব কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন দয়া করে সেটা জানাবেন কি? রমলাকে আপনি মনে রেখেছেন কি রাখেননি এটা শুনে সে দুঃখিত বা খুশি হতে পারে—কিন্তু আমার কি করার আছে? আমার স্ত্রীর সব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাব—এরকম আমি হীন নই। আপনার সঙ্গে যদি তার গোপনে সেন্টিমেন্টাল অ্যাফেয়ার থেকেই থাকে—তাতেই বা—

আমি হঠাৎ টেবিলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে বললুম, যদি বলছেন কেন? বলছি না, নেই! কিছু নেই! আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না?

অপরেশের মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল। অহংকারী গলায় বললেন, এটা একটা অফিস, দয়া করে মনে রাখবেন। নাটক করার জায়গা নয়—

এখনও মনে হচ্ছে বুঝি নাটক করছি?

আপনি আমার কাছে মহত্ত্ব দেখাতে এসেছেন, আপনি প্রেমিক আর আমি স্বামী। অর্থাৎ আপনি হলেন নায়ক, আমি ভিলেন। আপনার আত্মত্যাগ কী অসামান্য—রমলাকে আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আবার এসেছেন উদারতা দেখাতে—আপনি ব্যর্থ প্রেমিক—আপনি এসেছেন নায়িকাকে সুখী করতে! আমার কিছু যায় আসে না, আপনি রমলার সঙ্গে ব্যভিচার করুন কী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করুন, আমার কিছু যায় আসে না। দয়া করে শুধু আপনার ওই ফিলথি ফেস আমাকে আর দেখাবেন না।

অপরেশবাবু শুনুন—

আপনি যদি এখন চলে না যান, আমাকে ইংরেজিতে গেট আউট বলতে হবে। সেটা খুবই কর্কশ শোনাবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে অপরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলুম।

সেই হাসি দিয়ে আমি ওকে বললুম, তুমি একটা বিষম বোকা লোক।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমি সোজা চলে এলাম গড়িয়াহাটায়। ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হল না। তেতলায় তিনটে ঘরের ফ্ল্যাট। রমলা দরজা খুলতেই আমি জোর করে ঢুকে পড়লুম।

বিবর্ণ মুখে রমলা বলল, নীলুদা, একি সর্বনাশ করতে এসেছ আমার?

আমি দুহাতে জড়িয়ে ওকে বললুম, মিলু, আমাকে দয়া কর, দয়া কর। সাত বছর তোমাকে দেখিনি, আমি তো বেশ ছিলুম। কিন্তু সেদিন তোমাকে একবার দেখে আমার বুকের মধ্যে আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি আর থাকতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছি, মিলু, এই সাত বছর আমি তোমার কথাই ভেবেছি। তোমাকে ছাড় আমি কী করে বাঁচব মিলু?

না, না, নীলুদা, ও যে-কোনো সময়ে এসে পড়বে, এখন যাও, তোমার পায়ে পড়ি—

না, আসবে না। অফিস ছুটি হতে অনেক দেরি। তার আগে আমি তোমার সামনে বসে একটু কথা বলতে চাই।

সাড়ে চারটের সময় আমার ছেলেকে আনতে যেতে হবে স্কুল থেকে। নীলুদা, তুমি যাও।

সাড়ে চারটেরও একঘন্টা দেরি। মিলু, আমাদের আগেকার সবই কি মিথ্যে হয়ে গেল?

নীলুদা, তুমি কেন বিয়ে করোনি? কেন আমাকে ভুলে যাওনি। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

আমি আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারি না। আমি আজ তোমার কাছে আমার দাবি জানাতে এসেছি। তোমার বুকের বাঁ দিক আমার ছিল। আমি আমার জমি আবার উদ্ধার করে নিতে চাই।

রমলার মসৃণ, সৌরভময় শরীর আমার বাহুর মধ্যে। আমি বুঝতে পারলুম ওর শরীর কাঁপছে। হয়তো আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়—কিন্তু ওর একটা হাত আমার পিঠে। আমি ওর মুখ উঁচু করে কপালে ও ঠোঁটে চুমু খেলুম। মনে হল, ওর একটা ঠোঁট ঠান্ডা, একটা ঠোঁট উষ্ণ। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলুম।

রমলা ঠোঁটে হাত চেপে আর্তকণ্ঠে বলল, না, না, আমি পারব না, আমার ঘর সংসার সব ভেসে যাবে। আমি পারব না। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। কিন্তু আমার ছেলে আছে—

রমলার পায়ের কাছে বসে বললুম, মিলু, এবার তোমার পা দুটো আমার বুকের ওপর রাখি। বিশ্বাস করো, আমি সাত বছরে একটুও বদলাইনি। আমি দুর্বৃত্ত ডাকাত হয়ে যাইনি, কিছুই কেড়ে নেব না জোর করে। ...আমি নিজেকে বুঝতে পারি না ...কাল পর্যন্ত জানতুম, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, তোমার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই—কিন্তু আজ অপরেশের সঙ্গে দেখা করার পর—

তুমি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলে? কেন? তবে যে আমাকে কথা দিয়েছিলে—

জানি না। কেন যে দেখা করতে গেলাম জানি না। কিন্তু অপরেশ আমাকে অপমান করল—

রমলা আমার বুকের ওপর এসে হুহু করে কাঁদতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, আমিও তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম, ভুলতে পারিনি, অনেক চেষ্টা করেছি—ও আমার মুখ দেখে ঠিকই বুঝতে পারত—কিন্তু তুমি আবার কেন এলে? কেন?

জানি না। এক ঘন্টা আগেও ভাবিনি, তোমার কাছে কখনও আবার আসব। কিন্তু দেখলুম অপরেশ নির্বোধ।

সাত বছর আগে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

সে কথা সাত বছর আগে জানতুম। এখন ভুলে গেছি! এই সাত বছরে তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। কিন্তু তোমার শরীর এখনও আমার কাছে ঠিক সেই রকম চেনা।

তোমার চেহারা এমন রুক্ষ হয়ে গেছে কেন?

যদি বলি তোমার জন্য, তাহলে কি খুশি হবে? কিন্তু তা বোধহয় সত্যি নয়। মিলু, এখন যদি অপরেশ এসে পড়ে?

তাহলে আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে—

না, না, তুমি মরবে কেন? কিন্তু আমাকেও যেন জানালা দিয়ে লাফাতে বলো না। তিনতলা থেকে আমি লাফাতে পারব না। বাথরুমেও লুকোতে পারব না। বাথরুমের মধ্যে আমি ধরা পড়তে চাই না। খাটের তলায়ও ঢুকে থাকা অসম্ভব।

ওখানে নিশ্চয়ই আরশোলা আছে।

নীলুদা, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, সত্যি করে বলো?

আমি রমলার চুলের মধ্যে হাত বুলতে বুলতে বললুম, অপরেশ আমাকে আসতে বলল।

কী।

আমি অপরেশের কাছে গিয়েছিলাম। দেখলুম, ও একটা বোকা অহংকারী। ও আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল না যে, আমি সত্যি কথা বলেছি! ও আমাকে অপমান করে সুখী হতে চায়।

যেমন, ও তোমাকে চিরকাল সন্দেহ করেই সুখে থাকবে। ও তোমার ওপর অত্যাচার করবে না কোনোদিন। তোমাকে সন্তান দেবে, সম্পদ দেবে—তোমাকে ভালোবাসবে—কিন্তু সন্দেহ করে যাবে বহুদিন, সারাজীবন। আমার কাছ থেকে তোমাকে জয় করে নিয়েছে—এটা যেমন ওর গর্ব, তেমনি স্বামী হিসেবে তোমাকে সন্দেহ না করলে ওকে মানায় না—এ কথাও ও জানে। অর্থাৎ তোমার গোপন প্রেমের দুঃখ সত্ত্বেও—সবল সুস্থ স্বামী হিসেবে ও তোমাকে অধিকার করে আছে—এই হবে ওর সারাজীবনের অহংকার।

নীলুদা, তুমি কী বলছ।

ঠিক বলছি। ওর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার মনে হল, তাহলে আমিও বা কেন ক্ষতি স্বীকার করবো। আমি চাই তোমাকে দেখতে, আমি চাই তোমাকে ছুঁতে, তোমার বুকের গন্ধ শুঁকতে। সন্দেহ যখন ও করবেই—তখন আমি কেন ফিরে আসব না? শুধু গোপনতা রক্ষা করাই যথেষ্ট। অপরেশ এমন দুর্বল নয় যে, দুপুরে হঠাৎ অফিস থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে।

রমলা আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, কিন্তু আমি পারব না। এরকম আমি কিছুতেই পারব না। তুমি ওর দিকটাই ভেবে দেখছ, আমার কথা ভাবছ না? আমি কেউ নই, আমি একটা খেলনা? এতদিন আমি মনে মনে জানতাম, আমি বিয়ের পর থেকে ওর সঙ্গে কোনো ছলনা করিনি। মনে মনে তোমাকে ভুলতেই চেয়েছি। কিন্তু এখন ওর সঙ্গে অভিনয় করতে হবে নিয়মিত—সে গ্লানি আমি সইব কী করে?

তবে কি তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে?

কোথায়? সেদিন কাপুরুষের মতো দূরে সরে গিয়েছিলে, আজ আর কোথায় যাব! আজ তোমার সঙ্গে যেতে আমাকে যত মূল্য দিতে হবে—ভালোবাসার জন্য ততটা কি মূল্য দেওয়া যায়? না, যায় না!

ঠিক। শুধু ভালোবাসার জন্য কে আজকাল দুঃখকষ্ট সহ্য করতে চায়। অপরেশ জানে না, প্রেমিকরা আজকাল আর নায়ক নয়, স্বামীরাই নায়ক! নাটক নভেলে সেই পুরাতন ব্যাপার দেখা গেলেও জীবন এখন বদলে গেছে। প্রেমের জন্য কে আর আত্মত্যাগ করতে চায়। সব প্রেমিকই এখন ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি আর একটা চুমু খেয়ে মিলুর চোখের জল মুছে নেব ভেবেছিলুম—এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। মিলু ঝট করে ঘুরে সরে দাঁড়িয়ে বলল, এবার? এবার আমার কী হবে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অপরেশ নাকি?

নিশ্চয়ই।

যাঃ, তা হতেই পারে না। প্রতিবেশী হতে পারে, কোনো সেলসম্যান বা তোমার ঝি নেই।

হিংস্র চোখে রমলা বলল, আমি ওই আওয়াজ চিনি। শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করে গেলে।

সর্বনাশ কী মিলু। আমি তো তোমার পাশেই আছি!

রমলার চেহারা কী রকম হিংস্র হয়ে উঠেছে। বিস্রস্ত চুল, অল্প অল্প কান্নায় ফুঁসছে। দরজায় আবার ধাক্কা পড়তেই আমি দরজাটা খুলতে এগিয়ে গেলুম।

রমলা বললো, চুপ।

আমি বললুম, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক।

রমলা অল্প অল্প কান্নার আওয়াজ করতে করতে বলল, তুমি আমার কেউ নও। শুধু শুধু তুমি আমার সঙ্গে খেলা করতে এসে সর্বনাশ করে গেলে। আমি তোমাকে কোনোদিনও ভালোবাসিনি।

কিন্তু আমি এ ঘরে প্রথম ঢোকার পরই তুমি আমার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিলে।

চুপ। বলেই পাগলাটে ধরনের রাগে রমলা কী একটা পেপারওয়েট না অন্য কোনো ভারী জিনিস ছুড়ে মারল আমার দিকে। ওর ব্যবহার এমনই অস্বাভাবিক যে আমি মুখটা সরিয়ে নিইনি। সোজা এসে সেটা আমার কপালে ও নাকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলেও মনে হল ভাগ্যিস চোখে লাগেনি! আমার সাধারণ শরীর, তাই নাক দিয়ে বেশ রক্ত বেরিয়ে এল। আমি রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। রমলা আরও কি একটা যেন ছুড়ে মেরেছে আমাকে। কিন্তু ততক্ষণে আমি দরজা খুলে দিয়েছি।

একটা ফুটফুটে ছ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে, অপরেশ নয়। রমলার ছেলে—একাই বা কারুর সঙ্গে ফিরে এসেছে। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে তো ছেলেটাকে। মায়ের মুখ পেয়েছে।

ছেলেটা ঘরে ঢুকতেই, ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এল রমলা। রমলার কপালের টিপটা ধেবড়ে গেছে, চোখের পাশে শুকনো কান্না। কিন্তু এতটুকু ছেলের চোখে কি এসব ধরা পড়বে?

রমলার মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, তুই কার সঙ্গে এলি?

বিলটুদের গাড়িতে। তুমি এলে না।

নীলুদা, তুমি একটু বেঞ্জিন লাগাবে?

আমি হেসে বললুম, না, এমন কিছু লাগেনি। আমি যাই। আমি ছেলেটার চুলে হাত দিয়ে একটু আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—রমলা পেছন থেকে তাকিয়ে আছে কিনা তা দেখারও ইচ্ছে হল না একবার।

আমাদের মনোরমা

আমাদের এই খেপুতে জগুদার চায়ের দোকান ছিল খুব বিখ্যাত। এই খেপুতে আরও দুটো চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেগুলো হল রেস্টুরেন্ট। সে দুটোই বাজারের মধ্যে, একটা জুতোর দোকানের পাশে আর একটা বনশ্রী সিনেমা হলের গায়ে। সেখানে চায়ের সঙ্গে চপ-কাটলেটও পাওয়া যায়। সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই পেঁয়াজ আর বাসি মাছের আঁশের গন্ধে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। টেবিলে ভনভন করে নীল রঙের ডুমো ডুমো মাছি, সেগুলো উঠে আসে কাঁচা নর্দমা থেকে। পয়সা খরচ করে মানুষ অমন নরকেও খেতে চায়!

আমাদের জগুদার চায়ের দোকান ছিল একদম আলাদা। এ দোকানের কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। বাজার থেকে অনেকটা দূরে, একটা ছোটো টিনের ঘর, সেখানে চারটে নড়বড়ে কাঠের টেবিলের সঙ্গে আটখানা চেয়ার। তার আগে দুখানা বেঞ্চি, দরজার কাছে আজ়আড়ি করে পাতা—বেশি ভিড় হলে খদ্দেররা সেখানে বসে। অবশ্য তেমন বেশি ভিড় হয় কালেভদ্রে।

জগুদার দোকানে শুধু চা আর নোনতা বিস্কুট ছাড় অন্য কিছু পাওয়া যায় না বেশির ভাগ সময়। আর কেউ যদি সন্ধে ছটা থেকে আটটার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে জগুদার দোকানে, তাহলে সে পেতে পারে তিরিশ পয়সার এক প্লেট মাংসের ঘুগনি। আহা, তার যা সোয়াদ, বহুক্ষণ জিভে লেগে থাকে। আমরা বাজি রেখে বলতে পারি অমন ঘুগনি বদ্ধোমান বা কলকেতার কোনো দোকানেও কেউ পাবে না। তা আমাদের যখন ইভিনিং ডিউটি থাকে, তখন আর ওই ঘুগনি আমাদের ভাগ্যে জোটে না। ডিউটি শেষ করে বেরুতে বেরুতে রাত দশটা বাজে, ততক্ষণে ওই ঘুগনি ফিনিশ। কত করে আমরা বলেছি, জগুদা, তোমার ওই ঘুগনি একটু বেশি করে বানালেই পারো।

জগুদা ঘাড় নেড়ে বলেছে, না ভাই, তা হয় না। ওসব মাল একসঙ্গে বেশি রান্না করলে ঠিক সোয়াদ আসে না। সে ম্যাড়মেড়ে বারোয়ারি তারের জিনিস হয়। তা ছাড় খদ্দেরের মর্জির ওপর কী বিশ্বাস আছে? আজ তোমরা রাত দশটায় ঘুগনি খেতে এলে, কাল যদি না আসো? দোকানের মাল তাড়তাড়ি ফিনিশ হয়ে যাওয়াই বিজনেসের লক্ষ্মী!

জগুদার মাংসের ঘুগনির নাম ছিল প্যাঁটার ঘুগনি। শুধু খেপুতে কেন, আশপাশের সাত-আটখানা গাঁয়ের কোন মানুষটা অন্তত একবার জগুদার দোকানের বিখ্যাত প্যাঁটার ঘুগনি খায়নি?

ইভিনিং ডিউটির পর আমরা অনেক সময় জগুদার দোকানে শুধু চা খেতেও আসতাম। বারো নয়া পয়সায় এক কাপ গুড়ের চা। জগুদা সবাইকে বলে দিত, এই মাগগিগন্ডার বাজারে সে চিনি দিতে পারবে না। তবে সেই গুড়ের সঙ্গে আদা-টাদা মিশিয়ে এমন চা বানাতো যে একদিন খেলে রোজ না খেয়ে উপায় নেই।

আমরা জিজ্ঞেস করতাম, কী জগুদা, তুমি কি চায়ে আফিং মেশাও নাকি? নইলে এত টানে কেন?

জগুদা হেসে বলত, হ্যাঁ ভাই, আপিং বুঝি মাগনা পাওয়া যায়? বারো নয়ার চায়ে আমি কি আপিং মিশিয়ে ফৌত হব?

জগুদার দোকানে ধারের কারবার নেই। কোনো খদ্দের এক কাপ চা নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকলেই জগুদা হাঁক দিতেন, এই মনো, টেবিল মুছে দে!

ওইটাই খদ্দেরকে উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

পথ চলতি মানুষ অবশ্য জগুদার দোকানে বিশেষ আসে না। শনি মঙ্গলবারের হাটের দিনে তবু কিছু ভিড় হয়। আর বাদবাকি দিন আমাদের এই দেশলাই কারখানার ওয়ার্কাররাই আসে। কারখানার দরজা থেকে বিশ পা গেলেই জগুদার দোকান। তাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে। দোকানের পেছনে দশ কাঠা জমি জগুদারই, সেখানে সে মটর ডাল আলুর চাষ করে। ওই দোকানেরই লাগোয়া একখানা ঘরে জগুদার শোয়ার জায়গা।

এই দোকান আমরা দেখে আসছি আজ বিশ বছর ধরে। দোকানের অবস্থা একই রকম আছে, ক্ষতিও হয়নি, বৃদ্ধিও হয়নি।

বিয়ে-থা করেনি জগুদা। নিজের বলতে কেউ নেই। তবে বছর সাতেক আগে তার এক বিধবা মাসি এসে হাজির। সঙ্গে আবার বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে। অবস্থার বিপাকে মাসির ভিটেমাটি উচ্ছন্নে গেছে, দু-মুঠো অন্ন জোটে না। তাই জগুদার কাছে কেঁদে পড়েছিল।

জগুদা তাদের ফেলে দেয়নি একেবারে। দোকানের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাসির মেয়েটি হয়ে গেল দোকানের বয়। এর আগে জগুদা নিজেই খদ্দেরের টেবিলে চা এনে দিত, তখন থেকে সেই মেয়েটা এনে দেয়। আর মাসি বাসনপত্তর মাজে, ঘর মোছে, খেতের কাজ দেখে। অনেকদিন বাদে জগুদার ভাগ্যে খানিকটা আরাম জুটল। মাঝে-মাঝে জগুদা নিজেও এক কাপ চা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে গল্প করতে বসত।

আজ়ই বছর বাদে সেই মাসি মারা গেল ওলাওঠায়। আমরাই কাঁধ দিয়ে মাসিকে পুড়িয়ে এসেছিলাম নদীর ধারে।

মাসির মেয়ের নাম মনোরমা। এর মধ্যেই সে দোকানের কাজ বেশ শিখে নিয়েছে। ঠিক জগুদার মতনই চা বানায়। তার হাতের প্যাঁটার ঘুগনি বুঝি জগুদার থেকেও বেশি স্বাদের। আর পয়সা-কড়ির হিসেবেও বেশ পাকা। জগুদা তার ওপরে দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি।

মনোরমার বয়েস আর কতই বা, বড়ে জোর পনেরো-ষোলো, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন পঁচিশ ছাবিবশ। বেশ লম্বা, বড়ে-সড়ে চেহারা। একটু মোটার দিকে ধাত। রংটা তো বেশ কালোই, তার ওপর আবার ছেলেবেলায় পান বসন্ত হয়েছিল বলে মুখে একটা পোড় পোড় ভাব। মনোরমার গলার আওয়াজটা অনেকটা ছেলেদের মতন। লোকের মুখে মুখে চটাস চটাস করে কথা বলে সে।

জগুদা আর মনোরমা তখন থেকে সেই দোকানঘরেই একসঙ্গে থাকত বলে কেউ কেউ অকথা-কুকথা বলতে শুরু করেছিল। লোকের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। সব সময় জিভ সুড়সুড় করে, একটা কিছু পেলেই হল। মনোরমার মতন সোমত্ত মেয়ে রাত্তির বেলায় জগুদার মতন একটা পুরুষমানুষের কাছাকাছি শোয়—নিশ্চয়ই এর মধ্যে মন্দ কিছু থাকবে। হোক না মাসির মেয়ে—কী রকম মাসি তাই-বা কে জানে!

এসব কথা জগুদার কানে আসার পর সে দুঃখ পেয়েছিল। আমরা যারা পুরোনো খদ্দের, আমাদের কাছে আপসোস করে বলেছিল, আচ্ছা তোমরাই বলো দিকিনি, এমন পাপ কথাও লোকের মনে আসে? মেয়েমানুষে আমার অরুচি, নইলে এতগুলো বছর কেটে গেল একটা কি বিয়ে-থা করতে পারতুম না? ছি ছি ছি, ঘেন্না—নিজের মাসতুতো ভগ্নী, তাকে নিয়ে এমন কথা! মেয়েটা এখানে শোবে না তো কোথায় শোবে? ও মেয়েকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, আমি এক্ষুনি বিয়ে দিতে রাজি আছি। ধার দেনা করেও বিয়ে দেবো। তোমরা দ্যাখো না , কোনো পাত্তর আছে?

না, মনোরমার বিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। তার পোড় পোড় মুখে বসন্তের দাগ—তাকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড় মনোরমার অমন দশাসই চেহারা, তার সঙ্গে মানাবে এমন জোয়ান মদ্দই-বা কোথায়?

আমি, রতন, পরাণ আর জিতেন—আমরা ডিউটি সেরে রোজই একবার জগুদার চায়ের দোকানে যাই। আমরা জানি, জগুদা মানুষটা মন্দ না। মেয়েমানুষের দিকে তার টান নেই সত্যিই, নইলে এতগুলো বছরের মধ্যে একদিনও তো অন্তত একটা খিস্তি-খেউড় শুনতে পেতুম ওর মুখে।

তা, জগুদা আর মনোরমাকে নিয়ে বদনামটা রটবার পর কিন্তু জগুদার দোকানে ভিড় বেশ বেড়ে গেল! এক একসময় এসে আমরাই জায়গা পাই না। মনোরমার মুখখানা নাই-বা সুন্দর হল তার জামা উপছোন বুক আর ভারী পাছার দিকে নতুন খদ্দেররা হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকে। তারা দু-তিন কাপ করে চা খায়। বাজারের দুটো রেস্টুরেন্টের কোনোটাতেই তো কোনো মেয়ে এসে চা দেয় না।

এত খদ্দের বেড়ে যাওয়ায় জগুদা কিন্তু খুশি হয়নি। তার নিরিবিলি দোকানের বাঁধা খদ্দেরই পছন্দ। অচেনা খদ্দেররা কখনও একটু বেশি চেঁচিয়ে কথা বললে জগুদা হাঁক দেয় আস্তে, আস্তে, এটা হাটবাজার নয়।

যাই হোক, তবু তো বেশ চলছিল! এর মধ্যে জগুদা একটা মহা নির্বুদ্ধিতার কাজ করল। এই বছর প্রথম বর্ষার শুরুতে জগুদা একদিন হুট করে মরে গেল। মেয়ের কী দশা হবে, সেটা একবার ভাবল না পর্যন্ত।

সেদিন আমাদের নাইট ডিউটি ছিল। নাইট ডিউটি শেষ হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায়—ডিউটি সেরে আমরা ক'জন, না, সেদিন পরাণ ছিল না, তার বদলে আমাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চু—গুটিগুটি এলাম জগুদার দোকানে। এমন অনেকবার হয়েছে, আজ ভোরে জগুদার দোকানের ঝাঁপ ওঠেনি, আমরাই ডেকে তুলে উনুনে আঁচ দিয়েছি। অসময়ে এলেও জগুদা অসন্তুষ্ট হত না।

সেদিন এসে দেখি মনোরমা মড়কান্না কাঁদতে বসেছে! ও দাদা, দাদাগো—বলে সুর টেনে চলেছে মনোরমা। তাকে এর আগে আমরা তো কখনও কাঁদতে শুনিনি, তার মায়ের মৃত্যুর সময়েও সে চেঁচিয়ে কাঁদেনি—সেইজন্য তার ভাঙা ভাঙা গলা শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

ওপাশের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখি মেঝের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে জগুদা। চোখ দুটো খোলা, ওরে বাবারে, ওরকম চোখ দেখলেই ভয় করে। পঞ্চু নীচু হয়ে জগুদার গায়ে হাত ছুঁয়ে বলল, এ তো একেবারে ঠান্ডা কাঠ। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে।

পাশাপাশি দুটো বালিশ। জগুদা আর মনোরমা পাশাপাশি শুত তাহলে। সেমিজের ওপরে একটা আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে মনোরমা হাপুস হয়ে কাঁদছে। আমি অন্যদের অলক্ষ্যে মনোরমার বালিশটা পা দিয়ে ঠেলে ঘরের কোণের দিকে সরিয়ে দিলাম। এরপর পাঁচটা লোক আসবে, তারা এ নিয়ে আবার পাঁচ রকম কথা বলবে, কী দরকার।

শরীরে কোনো রোগব্যাধি ছিল না জগুদার। তবু এমন করে মরে গেল কেন? সবাই বলল, সন্ন্যাস রোগ। ও রোগে মানুষ এমনিই রাত্তিরবেলাই নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চলে যায়। আমাদের পঞ্চু বলল, জগুদার নিশ্চয়ই হার্ট উইক হয়ে গেশল। হোমিওপ্যাথিতে এর ভালো চিকিচ্ছে আছে। আহা, আগে জানলে—

যাই হোক আমরা সবাই মিলে তো জগুদাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এলুম। কিন্তু এবার মেয়েটার কী গতি হবে? সেই কথা বলেই মনোরমা কাঁদছিল। ও মা গো, আমি এখন কোথায় যাবো গো। আমি কার কাছে যাবো!

দু-তিন দিন তো এইভাবেই কাটল। আমরা

রোজই আসি। চা বন্ধ, কিন্তু এই দোকানটাতে আসাটাই যে আমাদের নেশা। গত কুড়ি বছর ধরে আসছি, হঠাৎ কি না এসে পারা যায়?

শেষে আমরাই মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম, তুই আবার দোকান খোল দিদি। তোকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, এই দোকানই তোর ভরসা। তা ছাড় এই দোকানটাই ছিল জগুদার প্রাণ, এটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে যে জগুদার আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

ছ'দিনের মাথায় মনোরমা চোখের জল মুছে আবার দোকানের ঝাঁপ তুলল। আবার খদ্দের আসতে লাগল। জগতে কেউ কারুর জন্যে বসে থাকে না। অমন যে জবরদস্ত হাসি-খুশি মানুষটা ছিল জগুদা, সে চলে যাওয়ায় কিছুই ঘাটতি পড়ল না, কিছুই থেমে থাকল না।

তবে ধন্য সাহস বটে মনোরমার। ওই মাঠের মধ্যে দোকানঘরে সে একলা থাকে। যে ঘরে জগুদা মরেছে, সেই ঘরেই সে এখন একলা শোয়, একটুও ভয়ডর নেই তার। আমরা বলেছিলুম কোনো একটা বুড়ি মেয়েমানুষকে ওর কাছে রাখতে। কাজকম্মেও সাহায্য হবে, রাত্তিরেও কাছে থাকবে। মনোরমা বলেছে, তার কোনো দরকার নেই। একটা লোক রাখা মানেই তো বাড়তি খরচ।

এক বচ্ছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও একটা চোর পর্যন্ত ঢোকেনি ওই দোকানঘরে। আমাদের এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়গুলোও সব রোগা প্যাংলা, তাদের এমন সাহস নেই যে, মনোরমার মতন অমন খান্ডারনি মেয়েমানুষের ঘরে ঢোকে। মনোরমার এখন ভারভাত্তিক চেহারা, দেখে কেউ ওর বয়স বুঝবে না। আমরা জানি, ওর বয়েস বাইশ। কিন্তু লোকে ভাববে বত্রিশ।

অ্যাদ্দিন কোনো সাইনবোর্ড ছিল না, এখন মনোরমা দোকানের সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। 'জগুদার চায়ের দোকান'। জগুদা এখন নেই, তবু দোকানের সঙ্গে তার নামটা টিকে গেল।

দোকান বেশ ভালোই চালাচ্ছে মনোরমা। আমরা ক'জন হলুম'গে তাঁর গার্জেন। আমরা সবচেয়ে পুরোনো খদ্দের, আর বলতে গেলে জগুদার বন্ধুই ছিলাম, তাই, আমাদের সে অধিকার আছে। মনোরমাও আমাদের তেমনভাবেই মান্য করে। আমাদের পরামর্শ-টরামর্শও মন দিয়ে শোনে। রোজ একবার করে আমরা খবর নিতে আসি। আমি, তরুণ, পরাণ আর জিতেন, মাঝে মাঝে পঞ্চুও এসে আমাদের সঙ্গে জোটে।

আমাদের দেশলাই কারখানায় তিন-রকমের ডিউটি। ডে, ইভিনিং আর নাইট। আমাদের কোন সপ্তায় কখন ডিউটি থাকবে, তা পর্যন্ত মনোরমার মুখস্থ। সেই অনুযায়ী সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। কখনও যদি আমাদের চারজনের এক শিফটে ডিউটি না পড়ে, তাহলে হয় গণ্ডগোল। তখন আর একসঙ্গে আসা হয় না। তবু একবার করে ঘুরে যাই সবাই।

একহাতে দোকান চালাবার ক্ষমতা রাখে বটে মনোরমা। সে-ই চা বানাচ্ছে, সে-ই ঘুগনি রাঁধছে, সে-ই টেবিল পরিষ্কার করছে। আজকাল আবার সে মামলেটও বানায়। নোনতা বিস্কুট ছাড়, সে একটা কাঁচের বোয়ামে কেকও এনে রেখেছে।

এক এক সময় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তার কেরামতি। কোনো একটা খদ্দের একটা অচল আধুলি দিয়েছিল। এক পেলেট ঘুগনি আর এক কাপ চা খেয়ে সে খুচরো আট পয়সা ফেরত চাইল না। বাবুগিরির কায়দায় সে মনোরমার সামনে আধুলিটা রেখে বলল, খুচরোটা তুমিই নিও!

সে খদ্দের দোকানের দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই মনোরমা ছুটে গিয়ে তার কাছা ধরেছে। কড়কড়ে গলায় মনোরমা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ওরে আমার ভালোমানুষের ছেলে! আমি কি তোমাকে নকল খাবার দিয়েছি যে তুমি আমাকে নকল পয়সা চালাচ্ছ?

খদ্দের যেন কিছুই জানে না , আমসিপানা মুখটি ভরে বলল, নকল পয়সা! কে বলেছে? এই তো আমি সিগ্রেটের দোকান থেকে একটু আগে ভাঙিয়ে আনলাম।

মনোরমা আধুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, সে তুমি সিগ্রেটের দোকানদারের সঙ্গে বোঝো গে। আমার খাঁটি জিনিসের খাঁটি পয়সা দিয়ে যাও!

পয়সাটা মাটিতে পড়ে ঠং করে শব্দ পর্যন্ত হল না।

খদ্দের পকেট উলটে বলল, আর তো পয়সা নেই!

খাবার বেলা সে কথা মনে ছিল না?

আমরা চারজন কোণের টেবিলে বসে মিটিমিটি হাসছি। আমরা তো জানিই, ও খদ্দের ব্যাটা বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে তক্ষুনি গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরব। আমরা মনোরমার গার্জেনরা এখানে বসে আছি। ও ভেবেছে মনোরমা অবলা মেয়েছেলে!

আমাদের সে রকম কিছু করবার দরকার হল না। মনোরমা নিজেই দোকানের বাকি খদ্দেরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আপনারাই পাঁচজনে বলুন, আমি খেটেখুটে দোকান চালাচ্ছি, কোনো দিন কারুকে খারাপ জিনিস দিইনি—কাল দুটো পচা ডিম বেরুল, তাও আমি প্রাণে ধরে ফেলে দিলুম—আর আমাকে এরকমভাবে লোকে ঠকাবে? এই কি ধর্ম?

যেসব নতুন খদ্দেররা মনোরমার গতর দেখতে আসে। তারা সঙ্গে সঙ্গে বললে, খুব অন্যায়!

নিশ্চয়ই ওর ট্যাঁকে আরও পয়সা আছে।

মনোরমা তখনো লোকটার কাছা টেনে ধরে আছে। লোকটার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মনে হয় কোনো সাধারণ হাটুরে লোক। তা বলে ওকে ছেড়ে দেবার কোনো কথাই ওঠে না।

পরাণ হাঁক দিয়ে বললে, ওর জামা খুলে নে, মনো!

লোকটা হাত জোড় করে বললে, আমাকে আজ ছেড়ে দিন। আমাকে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যেতে হবে। আমি কাল ঠিক এসে পয়সা দিয়ে যাবো!

শ্রাদ্ধবাড়ির কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রতন বললে, ব্যাটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যাবি তো জুতো পরে যাবার দরকার কী? জুতো জোড় খুলে রেখে যা!

লোকটার পায়ে প্রায় নতুন এক জোড় রবারের পাম্পশু। জামার বদলে শেষ পর্যন্ত জুতো জোড় খুলে রেখে লোকটা নিস্তার পেল। সে লোকটা আর জুতো নিতে আসেনি। জুতোজোড় পড়েই ছিল দোকানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কারখানার দারোয়ান দেড় টাকা দিয়ে সে-দুটো কিনে নিল।

আর একবার একটা লোক নাকি দুপুর দুপুর এসে ইচ্ছে করে মনোরমার গায়ে হাত দিয়েছিল। পয়সা দেবার সময় ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একেবারে মনোরমার বুকের ওপর। ঘটনাটি আমি নিজের চোখে দেখিনি, রতনের মুখে শুনেছি। আমাদের মধ্যে শুধু রতন ছিল দোকানে।

রতন লাফিয়ে উঠে গিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধরেছিল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে দোকানের বাইরে করে দিচ্ছিল, সেই সময়ে মনোরমা এসে বলেছিল, দাঁড়ও রতনদা, এ লোকটার বেশি রস উথলে উঠেছে, একটু শিক্ষা দিয়ে দিই! এই বলে মনোরমা লোকটার নাকে এমন ঘুষি মারল যে রক্ত বেরিয়ে গেল! মনোরমার ওই গোদা হাতের মার সহ্য করার ক্ষমতা আছে কার?

মনোরমা লোকটাকে সেই অবস্থায় দোকানের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ফের যদি এদিকে আসিস তোর একটা হাড়ও আস্ত রাখব না। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে দেব মুখে, বুঝলি।

এরপর থেকে রসিক ছোকরারা শুধু চাউনি দিয়ে মনোরমার গা চেটেই যা সুখ পায়, ধারে কাছে ঘেঁষতে আর সাহস করে না কেউ।

জগুদার সঙ্গে মনোরমার একটা ব্যাপারে বেশ মিল আছে। বেশি খদ্দের টেনে এনে বেশি লাভ করার দিকে তারও লোভ নেই। বাছাই করা খদ্দের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট দোকান চালাতেই সে চায়। সে খাঁটি জিনিস দেবে। তার বদলে ভেজাল খদ্দের তার দরকার নেই।

যে যে হপ্তায় ইভিনিং ডিউটি থাকে, সেইসব সময়েই জগুদার দোকানে আমরা বেশিক্ষণ কাটাই। ডিউটি শেষ হয় রাত নটায়—কোনো কোনোদিন সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে আসি। আট ঘন্টা ডিউটির পর আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে তবু তখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় কোথাও নিরিবিলিতে বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

তা রাত নটার পর জগুদার দোকান একেবারে নিরিবিলিই হয়ে যায়। লাস্ট বাস চলে যায় ন'টা দশে, তারপর এ রাস্তায় তো আর মানুষজন থাকেই না বলতে গেলে। মনোরমা আমাদের ডিউটির সময় জানে , আমরা দোকানে ঢুকে বসবার সঙ্গে সঙ্গে সে চা এনে দেয়। অ্যাসট্রের ছাই ফেলে পরিষ্কার করে আনে। তারপর সে ক্যাশের সামনে বসে সারাদিনের হিসাব করতে বসে। সেই সময় সে আপন মনে গান গায়।

মনোরমার গান ভারী অদ্ভুত। তার গলা ভালো না। কথা বলার সময় তার গলাটা পুরুষমানুষের মতন হেঁড়ে হেঁড়ে মনে হয়। কিন্তু গান গাইবার সময় সে একটা অদ্ভুত সরু গলা বার করে, অনেকটা কুকুরের কুঁইকুঁই-এর মতন। যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সেই কুকুরই তো আবার কুঁইকুঁই করে এক সময়। মনোরমাও সেই রকম। আর রোজ সে একই গান গায় :

যে জ্বরে জ্বরেছে মা, তোর কানাই

মা, তোমায় কেমনে জানাই

এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

শুধু ওইটুকুই আর বেশি না। ওই ক'টা লাইনই বার বার ঘুরে ফিরে গায়। এই অদ্ভুত গান। এই অদ্ভুত গান কোথা থেকে সে শিখল তাও জানি না।

রতন জিজ্ঞেস করে, আজ কত বিক্কিরি হল মনোদির?

মনোরমা উত্তর দেয়, সাতাশ তিরিশ নয়া। তা ভালোই হয়েছে।

যেদিন বিক্কিরি অনেক কম হয়, সেদিন সে কোনো আফসোস করে না। রোজই পয়সা গোনার সময় সে এ রকম সন্তুষ্টভাবে গান গায়।

এক একদিন সে আমাদের জন্য ঘুগনি বাঁচিয়ে রাখে। বিশেষ করে শনিবার। মনোরমা জানে। রবিবার আমাদের অফ ডে, তাই শনিবার রাত্রে স্ফুর্তি করি। চায়ের কাপ নিয়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকি এক কোণের টেবিলে। কোনো কথাও বলি না। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর আমরা আড়মোড় ভাঙি। তখন রতন বলে, মনো দিদি, চারটে গেলাস দিবি?

মনোরমা আমাদের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে জাঁদরেল ভঙ্গিতে দাঁড়য়। তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, এখন বুঝি ওইসব ছাই-ভস্ম খাওয়া হবে আবার?

আমাদের একজনের পকেট থেকে একটা বাংলার পাঁইট বেরোয়। আমরা বলি, এই তো এইটুকুনি, এ তো এক চুমুকেই শেষ হয়ে যাবে!

মনোরমা বলে, ঠিক? আর বেশি খাবে না?

না দিদি, আর পাবো কোথায়?

আমরা মনোরমার গার্জেন। কিন্তু এই সময় সে-ই আমাদের ওপর গার্জেনি করে। আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই যে একটা করে পাঁইট আছে, সে কথা জানতে দিই না ওকে।

মনোরমা চারটে গেলাস নিয়ে আসে। নাক সিঁটকে বলে, ইঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ। তোমরা এসব খেয়ে যে কী আনন্দ পাও!

তুই একটু খাবি নাকি? তাহলে তুইও আনন্দ পাবি!

রক্ষে করো! আমার আর আনন্দ পেয়ে দরকার নেই। আমি বেশ আনন্দেই আছি!

প্রত্যেক শনিবার ঠিক এই একই কথা হয়। প্রত্যেকবারেই আমরা এতে আনন্দ পাই। মনোরমা আমাদের জন্যে চার প্লেট ঘুগনি নিয়ে আসে। তখনও গরম। আমাদের জন্য যত্ন করে ঘুগনিটা আবার গরম করেছে, এই জেনে বেশ সুখ হয়।

মনোরমা কিচেনে গেলেই আমরা পকেট থেকে বোতল বার করে আবার গেলাসে ঢেলে নিই। ক্রমে ক্রমে নেশা ধরে, আমাদের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কপালে বিন বিন করে ঘাম। পরাণ একটু গান ধরতে গেলেই জিতেন তাকে ধমকে ওঠে, চোপ। তুই গান গাইবি না। এখন আমরা মনোরমার গান শুনবো।

রতন বলে, মনো, আমাদের কাছে একটু আয় না দিদি!

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমরা আর কত দেরি করবে?

এই তো হয়ে এলো, আর একটু বাদেই চলে যাব। আয় না, আমাদের কাছে এসে একটু বোস, দুটো কথা বলি।

মনোরমা একটা চেয়ার টেনে এনে বসে। একটু দূরে, যাতে বাংলার গন্ধটা তার নাকে না যায়।

জিতেন বলে, ধর তো মা তোর ওই গানটা!

মনোরমা অমনি তার সেই গান ধরে, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

বার বার শুনতে শুনতে আমাদের ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, আহা, কী আশ্চর্য গান! এমনি কখনও শুনিনি! পরাণ টেবিল চাপড়ে তাল দেয়। রতন আহা আহা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

মনো, তুই নাচ জানিস না দিদি?

মনো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখবে? আমার নাচ দেখবে?

অমনি সে দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে চোখ বুজে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ঠিক আনি মানি জানি না খেলার মতন। এই রকম বোঁ বোঁ করে ঘোরাকে যে কেন ও নাচ বলে, তা আমরা বুঝি না। তবু প্রত্যেক শনিবার আমরা মনোরমাকে নাচতে বললেই সে এরকম ঘোরে।

তখন মনোরমাকে বড়ো সুন্দর লাগে আমাদের! হোক না সে কালো, বসন্তের দাগওয়ালা পোড়ো পোড়ো মুখ, হাত-পাগুলো মুগুরের মতো, আর বিরাট বিরাট দুই বুক আর পাছা—তবু সুন্দর দেখায় তাকে।

মনোরমার নাচের সময় আমরা চারজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ি। ওর নাচটা আমাদের খেলা। আমরা বয়স্ক চারজন লোক সেই সময় খেলায় মেতে উঠি। আমরা দূর থেকে বলি, মনো, আমাদের ধর দেখি!

মনোরমা ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের একজনের গায়ের ওপর পড়ে। সে তখন টুঁ শব্দটি করে না। তখন মনোকে বলতে হবে, সে কাকে ছুঁয়েছে।

মনোরমা চোখ না খুলেই তার গায়ে হাত বুলোয়। থুতনি ধরে নাড়ে, দুষ্টুমি করে কান দুটো টানে, তারপর চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ও এ তো বঙ্কুদা!

মনোরমা যখন আমাকে ধরে এরকম গায়ে মুখ হাত বুলোয়। আমার শরীরটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয়, মনোরমা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে চিনতে না পারুক!

অন্যরা তখন হিংসে হিংসে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। এক রাত্তিরে এই খেলা দু'বার খেলে না মনোরমা। সুতরাং একজনেরই ভাগ্যে শুধু মনোরমা আসে এক এক শনিবারে।

আমাদের বাড়িতে বউ ছেলেপুলে আছে। বুড়ি মা আছে, অভাব আছে, ফুটো টিনের চাল আছে। পোকা লাগা বেগুন আছে। আর অনেক কিছুই নেই। বাড়িতে গেলেই তো শুনতে পাই হ্যানো নেই, ত্যানো নেই। কিন্তু শনিবার রাত্তিরে এ সময়টা আমরা সেসব কিছু ভুলে যাই। তখন শুধু আমরা চারজন আছি, আর মনোরমা।

ছেলে-ছোকরারা হাতে পয়সা পেলেই বাজারের সিনেমা হলে ছোটে। সেখানে ধর্মেন্দর আর হেমা মালিনীর জাপটা-জাপটি দেখে তারা কী সুখ পায় কে জানে। আমাদের সিনেমা হলটাও হয়েছে এমন, হপ্তায় দুবার করে বই পালটায়। আমরা ওসব দেখতে যাই না কখনও। আমাদের মনোরমা আছে।

রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। মনোরমা বলে, ওগো, তোমরা বাড়ি যাবে না? এরপর বাড়ি গেলে যে বউ তোমাদের প্যাঁদাবে।

আমরা হা হা করে হেসে উঠি। মনো এমন মজার কথা বলে। আমরা জানি, মনোরমা এরপরই একটা গল্প বলবে। প্রত্যেক শনিবারই বলে। বর্ধমানে ওরা কিছুদিন এক কাকার বাড়িতে ছিল। সে বাড়ির ওপরতলায় থাকত এক ভদ্রলোক আর তার বাঁজা বউ। ভদ্রলোকটি রোজ রাত্তিরে মাল টেনে আসত আর বাড়ির দরজায় ঢুকেই বলত, আর করব না, আর কোনোদিন করব না! কিন্তু তার বউ তখুনি ছুটে এসে তাকে দুমদাম করে মারত। সে কী মার! অনেক দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়। লোকে শুনে ভাবে, ছাদ পেটাই হচ্ছে।

গল্প শুনে আমরা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ি। প্রত্যেক শনিবার। জিতেন পেট চেপে ধরে বলে, থাম, মনো থাম, আর বলিস না! ওসব ভদ্রলোকদের কথা আর বলিস না! টাকা রোজগার করে যে বউকে খাওয়াবে আবার সেই বউয়ের হাতে মারও খাবে, এসব ভদ্রলোকেরাই পারে!

পরাণ বলে, মনো, আমাদের মতো কেউ যদি তোকে বিয়ে করত, তুই তাকে মারতিস!

মনোরমা বলে, মারতাম না আবার! মেরে একেবারে পাট করে দিতাম।

রতন বলে, ভাগ্যিস আমি তোকে বিয়ে করিনি! তোর হাতের মার খেলে আমি মরেই যেতাম!

রতন এক-এক দিন নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি বার করে। উঠে দাঁড়তে গিয়ে হঠাৎ উ-হু-হু করে ওঠে। তারপর বলে, ইস পায়ে খিল ধরে গেল। মনো একটু টেনে তোল তো আমাকে!

মনোরমা এসে তাকে টেনে তুলতেই সে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেন বাতের রুগি। কিন্তু ওসব চালাকি কি আর আমরা বুঝি না!

পরাণ আজ বলে, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। কি রে বঙ্কা, তোর ধরেনি? জিতেন?

আমরা বলে উঠি, হ্যাঁ আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। আমরা তো একসঙ্গে বসে আছি।

জিতেন বলে, রতনকে মনো টেনে তুলেছে। আমাদেরও টেনে তুলবে!

মনো হেসে ফেলে বলে, তোমরা সব বুজে খোকা! তোমাদের নিয়ে আর পারি না! এবার যাও, নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব বলছি!

ব্যাস, ওই পর্যন্ত। ওর বেশি আর আমরা এগোই না। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমাদের তো ঘরসংসার আছে। একটা করে বাড়ি আছে। সে বাড়িতে কত কিছুই নেই। আমরা বেরিয়ে আসার পর মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। আমরা চারজন পাশাপাশি হাঁটি।

এক সময় রতন বলে, আমাদের মনো বজে ভালো মেয়ে।

আমরা বাকি তিনজন তখন ওই এক কথাই ভাবছিলাম।

রতন বলে, এমন ভালো মেয়ে, অথচ তার একটা বিয়ে হল না! মেয়েটা সারা জীবন এরকম কষ্ট পাবে?

আমরা আমাদের মনের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। মনোরমার সঙ্গে বিয়ে দেবার মতো কোনো পাত্রের কথা মনে পড়ে না।

রতন কাঁদতে আরম্ভ করে। একটু নেশা হলেই কান্নাকাটি করা রতনের স্বভাব। ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় সে বলে, আমি যদি আগে বিয়ে না করে ফেলতাম তাহলে আমিই মনোকে বিয়ে করতাম। এ কথা নিশ্চয় করে বলছি। আহা মনোরমার হাতে মার খেয়েও আমার সুখ হত।

বলতে বলতে রতন হঠাৎ থেমে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকায়। আমরা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছি। রতনটা স্বার্থপরের মতো কথা বলছে। আমরাও তো ভুল করে ফেলেছি আগে। আমাদেরও বাড়িতে প্যানপেনে রোগাপটকা, অসুখে-ভোগা, হাড়-জ্বালানি বউ আছে। তার বদলে মনোরমাকে বিয়ে করলে অনেক বেশি সুখ হত। কিন্তু, একজন কেউ বিয়ে করলেই তো মনোরমা শুধু তার হয়ে যেত। বঞ্চিত করা হত আর তিনজনকে। তখন কি আর অন্য কেউ পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে বলে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরতে পারত?

না! আমরা আগে বিয়ে করেছি, ভালোই হয়েছে। আমরা কেউ আর মনোরমাকে বিয়ে করতে পারব না। সেইজন্যই, মনোরমা আমাদের চারজনের হয়ে থাকবে। তাই তো আমাদের আড্ডায় পঞ্চুকেও সঙ্গে আনি না।

আমাদের দেশলাই কারখানায় দুম করে পাঁচজন লোক ছাঁটাই হয়ে গেল। তার মধ্যে আমরা কেউ পড়িনি বটে, কিন্তু শুনছি আরও ছাঁটাই হবে। কখন কার ওপর কোপ পড়বে তার ঠিক নেই। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। বাজার খুব মন্দা! ম্যাড্রাস থেকে সস্তা দামের দেশলাই এসে বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

ডিউটি শেষ করে বেরুবার সময় মুখটা তেতো তেতো লাগে। প্রত্যেকদিন ভয় হয়, কাল এসে কী নুটিস ঝুলতে দেখবে কে জানে। আবার কেউ কেউ বলছে, লক আউট হবে!

ব্যাজার মুখ করে জগুদার চায়ের দোকানে আসি। মনোরমা দোকানটাকে বেশ দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্রায় সে বলে, দোকানের জন্য এবার সে ফার্নিচার করবে। চেয়ার টেবিলগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, কয়েকখানা না বদলালেই নয়।

আমরা মনোরমাকে ঠান্ডা মাথায় উপদেশ দিই। এক্ষুনি হুট করে কিছু করে ফেলিস না দিদি! দিন কাল ভালো নয়। হাতে পয়সা থাকা

ভালো।

মনোরমা বলে, তোমরা আজকাল এত গোমড়া মুখে থাকো কেন গো? আর বুঝি এ দোকানের চায়ে স্বাদ নেই?

আমরা হাহা করে উঠি। সে কি কথা! মনোরমার চায়ের হাত দিন দিন মিষ্টি হচ্ছে। গুড় দিতে ভুলে গেলেও মিষ্টি।

আমরা মনোরমার দোকানে কখনও ধার রাখি না। এ নিয়ম সেই জগুদার আমল থেকে চলে আসছে। ধার রাখলেই ধার জমে যায়—পরে আর শোধ করা হয় না। ধার রাখলেই দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব নষ্ট হয়। আমরা চারজন এখন মনোরমার গার্জেন, কিন্তু কেউ বলুক দেখি কোনো একদিনও ওর দোকানে মাগনায় খেয়েছি। হাতে পয়সা না থাকলে সেদিনটা আর দোকানেই আসি না। তবে, আমরা সকলেই জানি। আমাদের একজন না গেলেও অন্য তিনজন যাবে, মনোরমার দেখাশোনা করে আসবে।

তবে, শনিবারের আড্ডায় কেউ বাদ পড়ি না। কারখানার ফোরম্যানকে ঘুষ দিয়ে হাত করা আছে, কোনো রবিবার আমাদের নাইট ডিউটি দেবে না!

শনিবার দিন পকেট থেকে আমরা মালের বোতল বার করলে প্রত্যেকবার মনোরমা বকাঝকা করে। কিন্তু আমরা জানি, শনিবারের এই মজাটুকু মনোরমাও পছন্দ করে খুব, সারা হপ্তা মনোরমাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে, ওর তো জীবনে আর কোনো আনন্দই নেই। আমাদের সঙ্গে ওইটুকু খেলাধুলোই ওর ফুর্তি।

তা এক শনিবার আমরা অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছি, শেষ লোকটা আর কিছুতেই ওঠে না। লোকটা এক টেবিলে একা বসে আছে, একটা হাত থুতনিতে, কী যেন ভেবেই চলেছে। রোগা লম্বাটে চেহারা লোকটার, জামাকাপড় বেশ ফরসা। একে আগে কখনও দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটা বুঝি মনোরমার দিকে হ্যাংলা দৃষ্টি দিচ্ছে, তারপর বুঝলাম, তা না, লোকটার চোখ শুধু দেয়ালের দিকে—সে অন্য কিছুই দেখছে না।

আমাদের এ দোকান থেকে বিনা দোষে কোনো খদ্দেরকে কখনও তাড়িয়ে দিই না। কেউ যদি একটু বেশিক্ষণ বসতে চায় বসুক না! কিন্তু লোকটা এক কাপ মাত্র চা নিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

রতন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ক'টা বাজল।

পরাণ বলল, ন'টা বেজে গেছে!

জিতেন বলল, লাস্ট বাস এক্ষুনি চলে যাবে বোধহয়!

আমরা ভাবলাম, যদি এসব কথা শুনে লোকটা উঠে পড়ে। ভিনদেশী লোক, লাস্ট বাস চলে গেলে ফিরবে কী করে?

লোকটা এসব কথা শুনেও উঠল না। বরং টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এ আবার কী ব্যাপার!

আমরা মনোরমাকে চোখের ইশারা করলাম। মনোরমা লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই ক্যারকেরে গলায় বলল, আপনি চা খাবেন না? এ তো অনেকক্ষণ ঠান্ডা হয়ে গেছে!

লোকটা কোনো কথা না বলে শুধু মুখ তুলে মনোরমার দিকে তাকাল।

মনোরমা আবার বললে, আমি এবার দোকান বন্ধ করব।

লোকটা আস্তে আস্তে বলল, আমি এই টেবিলের ওপর শুয়ে থাকব শুধু আজকের রাতটা।

এ আবার কেমনধারা কথা! সুবিধে মনে হচ্ছে না তো! গলার আওয়াজ শুনে মনে হল লোকটা নেশাখোর। ওসব ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই এখানে চলবে না। ও তো জানে না, আমরা মনোরমার গার্জেন, এখানে উপস্থিত আছি!

রতন উঠে গিয়ে বললে, এই যে মশাই উঠুন! এটা ঘুমোবার জায়গা নয়!

লোকটা বললে, শুধু রাতটা...এখানে থাকব... তার জন্যে পয়সা দেব।

রতন এবার লোকটার প্রায় ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বলল, ঘুমোতে হয় তো হোটেলে যান না, এখানে কেন?

হোটেল আছে এখানে?

বাজারের কাছে আছে অন্নপূর্ণা হোটেল, সোজা সেখানে চলে যান।

তাই যাব, আমাকে একটু ধরে তুলুন তো, উঠতে পারছি না।

রতন লোকটার গায়ে হাত দিয়েই চমকে বলে উঠল, ওরে বাবা, এ কী?

তারপর আমাকে ডেকে বলল, বঙ্কু, একবার এদিকে আয় তো।

আমি উঠে যেতেই রতন বলল, লোকটার কী হয়েছে, দ্যাখ তো?

লোকটা আবার ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়েছে। আমি তার একটা হাত ছুঁয়ে রতনের মতনই চমকে উঠলাম। লোকটার গা অসম্ভব গরম।

আমি বললাম, এ লোকটার তো খুব জ্বর হয়েছে দেখছি।

লোকটি আবার মুখ তুলল, চোখ দুটো অসম্ভব লাল। সে বলল, আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি ঠিক যেতে পারব।

লোকটির কথাবার্তা আমাদের মতন নয়। বোঝাই যায়, শহুরে ভদ্দরলোক। টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, ফরসা রং—সিনেমায় এমন চেহারা দেখা যায়। এমন লোক হঠাৎ আমাদের এখানে এসেছে কেন?

আমি আর রতন লোকটিকে দুদিক থেকে ধরে তুললাম। লোকটি মাতালের মতন টলতে লাগল। রতন জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে?

লোকটি বললে, মাথায় অসহ্য ব্যথা!

জিতেন চেঁচিয়ে বলল, বোধহয় ম্যালেরিয়া ধরেছে।

আমি বললাম, আপনি এই অবস্থায় যাবেন কী করে? মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে। আপনার বাড়ি কোথায়?

অনেক দূর।

এখানে কোথা থেকে এসেছেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, আমাকে দয়া করে একটু রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিন!

মনোরমা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল, জ্বর হয়েছে, না নেশাভাঙ করেছে?

আমি বললাম, নেশা করলে গা গরম হয় না।

রাস্তা দিয়ে কি হাঁটতে পারবে?

বোধহয় পারবে না!

তাহলে ওই টেবিলের ওপরই শুইয়ে রাখো!

এই কথাটা আমিও ভাবছিলাম। একটা অসুখে পড়া অসহায় লোককে রাস্তায় ফেলে রেখে আসার কোনো মানে হয় না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক, পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে। সে এখানে মরতে এল কেন?

লোকটাকে আমরা টেবিলের ওপরেই শুইয়ে দিলাম। একটা ডাক্তার এনে দেখালে ভালো হত। কিন্তু অত রাত্তিরে ডাক্তারই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম, আপনি কিছু ওষুধ-টষুধ খাবেন না!

লোকটা বলল, না, দরকার নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনোরমা বলল, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দেব?

তা দাও না।

মনোরমা ঘর মোছার বালতিতে করে নিয়ে এল এক বালতি জল আর মগ। মগে করে মাথায় জল ঢালতে গিয়ে বলল, ও মা, এর মধ্যে দেখছি অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডান পায়ের গোড়লিটা দ্যাখো রতনদা, কতখানি ফুলে আছে , নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে পায়ে। সাপে-টাপে কামড়য়নি তো?

রতন বলল, দূর! সাপে কামড়লে কি এতক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে? এমনি জ্বর-জারি হয় না মানুষের! সত্যি কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? দেখি—রতন দু'চার বার নাড়চাড় দিয়ে দেখল, তবু লোকটার আর সাড় নেই। সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনোরমা তবু জল দিয়ে তার মাথাটা ধুইয়ে দিল।

এত হাঙ্গামার মধ্যে আর আমরা পকেট থেকে বাংলার বোতল বার করতেই পারিনি। রাত বাড়ছে, বাড়িতেও তো যেতে হবে।

পরাণ অধৈর্য হয়ে বলল, ও মনো চারটে গেলাস দে ভাই, আর দেরি করতে পারছিনি।

সেদিন খাওয়া হল বটে, কিন্তু জমল না। মনোরমা গান গাইল না। আমরা তাকে নাচতে বলতেও পারলাম না। ঘরের মধ্যে একটা অচেনা লোক হাত পা চিতিয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে কি আমরা আনি মানি জানি না খেলতে পারি! প্রতি শনিবার রাতে মনোরমার সঙ্গে আমাদের এই যে খেলাটা—সেটা তো সারা পৃথিবীর অজান্তে। তখন আর বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। আজ শুধু আমরা চারজন আর মনোরমা। এর মধ্যে আবার এই উটকো উৎপাত এল কেন? এর বদলে একটা ডাকাত এলেও আমরা প্রাণপণে লড়ই করে তাকে মনোরমার কাছে ঘেঁষটে দিতাম না। কিন্তু এ যে একজন অসুস্থ লোক, একে রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায় কী করে? মনোরমা এর মাথা ধুইয়ে দিলেও আমরা আপত্তি করতে পারি না।

অনেকটা ঝিম মেরে বসে থেকেই আমরা সময় কাটিয়ে দিলাম। এবার যেতে হবে। উঠে এসে আমরা প্রত্যেকে আবার লোকটার কপাল ছুঁয়ে দেখলাম। আমরা সঠিক জেনে নিতে চাই লোকটা সত্যিই অসুস্থ কিনা। যদি অসুখের ভান করে ঘাপটি মেরে থাকে, তাহলে এই দণ্ডেই আমরা ওকে লাথি মেরে বার করে দেবো।

না। গা এখনও গরম আগুন। এখনও জ্ঞান নেই। নিজের গা কেউ ইচ্ছে করে গরম করতে পারে না!

আমরা বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি দেখে মনোরমা জিজ্ঞেস করল, এ এমনিই শুয়ে থাকবে? রাত্তিরে খাবে-টাবে না কিছু?

রতন বলল, খাওয়ার আর ক্ষমতা নেই।

ও রতনদা, যদি লোকটা মরে-টরে যায়?

আরে না। মরা অত সহজ নাকি? জ্বর হলে কেউ মরে না। লোকটা থাক এ রকম শুয়ে।

সকাল হলে বিদায় করে দিবি।

আমরা বেরিয়ে এলাম। মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে খিল লাগাল। আমাদের চার জনেরই মনের মধ্যে অস্বস্তি। আমরা মনোরমার গার্জেন , আর রাত্তিরবেলা তার কাছে আমরা অচেনা লোককে রেখে এলাম। এ ছাড় আর উপায়ই বা কী?

একটু বাদে জিতেন বলল, লোকটা কে? চোর ছ্যাঁচোড় না তো?

পরাণ বলল, দেখে তো তা মনে হয় না।

আরে রাখ রাখ! চেহারা দেখে কি আর মানুষ চেনা যায়? বড়ে বড়ে শহরের চোরদের চেহারা ওরকম ভদ্দরলোকের মতনই হয়!

তা শহরের চোর জগুদার চায়ের দোকানে কী চুরি করতে আসবে?

রাজবন্দি নয় তো? জেল-টেল থেকে পালাতে পারে!

লোকটা নাম বলেনি, ধাম বলেনি! কোথা থেকে এল!

পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামা হবে না তো!

রতন থমকে দাঁড়ল। চিন্তিত ভাব করে বলল, আমাদের কারো আজ রাতে মনোরমার কাছে থাকা উচিত ছিল। যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়।

আমরা বাকি তিনজন তীক্ষ্ণ চোখে ওকে বিঁধলাম। রতনটা স্বার্থপরের মতন কথা বলছে। আমাদের প্রত্যেকেরও কি সেই ইচ্ছে হচ্ছে না? মনোর বিপদের সময় তার পাশে বুক পেতে দাঁড়তে কি আমরা চাই না? কিন্তু এ কথাও জানি, আমাদের মধ্যে একলা কেউ মনোর সঙ্গে সারারাত থাকলে সে একলা একলা আনি মানি জানি না খেলা খেলবে। তাতে আমাদের বাকি তিনজনের বুক জ্বলে যাবে না।

রতন আমাদের তীক্ষ্ণ চোখ দেখে থতমত খেয়ে গেল। আবার চলা শুরু করে সে বলল, বাড়ি না ফিরলে বউ কি আমাকে ছাড়বে? নিজেই ছুটে আসবে হয়তো! জানে শনিবার এই সময়টা কোথায় থাকি!

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমাদেরও ঘরে বউ ছেলেপুলে আছে। অশান্তি এত বেশি আছে যে আর বেশি অশান্তি ডেকে এনে কোনো কাজ নেই। মনোরমার কাছে যদি রাত্রে থেকে যাই, তাহলেই বাড়িতে অশান্তি। মনোর কাছে কেউ একা এল কিনা, সেটা দেখবার জন্যে আমরা বাকি তিনজন তক্কেতক্কে থাকি। মনোরমা আমাদের চারজনের একা কারুর না।

রোববারটা আমাদের চারজনেরই ছুটি। সকালবেলা বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে আমি চলে এলাম জগুদার দোকানে। আর তিনজনও এসে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

চায়ের জন্য তখন আর কোনো খদ্দের আসে নি। শুধু আমরাই চারজন। সেই লোকটা টেবিলের ওপর নেই।

ও মনো, মনোদিদি!

কোনো সাড়শব্দ নেই। পিছনে রান্নাঘর। অন্যদিন তো উনুনে আঁচ পড়ে যায় এই সময়। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরের মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে মনোরমা। আবার আমাদের ডাক শুনে সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল। চোখ মুছে বললে, তোমরা এসে গেছ।

তুই এখানে ঘুমুচ্ছিস কেন?

ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়, শুয়েছিলাম! সারা রাত একটু ঘুমুতে পারিনি। আমার এত ভয় করছিল!

আমরা অবাক! মনোরমার ভয়? তাকে আমরা কোনোদিন এ রকম কথা বলতে শুনিনি। বলি, কেন মনোদিদি, ভয় করছিল কেন? কী হয়েছে?

মনোরমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বলল, সারারাত লোকটার বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে মা মা বলে ডেকে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, ও বুঝি যে-কোনো সময় মরে যাবে। এ রকম একটা লোককে তোমরা এখানে রেখে গেলে কী আক্কেলে। আমার কথাটা ভাবলে না?

ভেবেছিলাম মনো, আমরা তো সারারাতই তোর কথা ভেবেছি। পাশে শোয়া রোগা বউ, ছেলেমেয়েগুলোর চ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না, এর মধ্যেও তো আমরা তোর কথাই ভাবি। তুই ছাড় আমাদের কী আর আছে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও আমরা একলা কেউ তো এখানে থাকতে পারি না। তা লোকটা গেল কোথায়? চলে গেল?

কোথায় চলে যাবে? দেখো গে শুয়ে আছে আমার ঘরে।

তোর ঘরে? নিজে নিজে উঠে গেল? তাহলে তো মানুষটা অতি বদ।

নিজে নিজে যাবে কেন! সে শক্তি কি আছে? রাত্তিরবেলা অমন ঘড়ড় ঘড়ড় করছিল, আমার ভয় হল যদি টেবিল থেকে উলটে পড়ে যায়? তাহলে তো সেই অবস্থাতেই মরবে। তখন আমারই তো হাতে দড়ি পড়বে।

আমরা তাড়তাড়ি গিয়ে উঁকি দিলাম মনোরমার ঘরে। যে-বিছানায় জগুদাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেইখানে ঠিক সেই রকম হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আমাদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল একবার। সত্যি মরে গেছে নাকি?

পরেই বুঝলাম, না। নিশ্বাসে বুক উঁচু নীচু হচ্ছে। লোকটার কপালে জলপটি। মনোরমা যত্ন করে

তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়েছে।

মনোরমা নিজেই একে পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছে টেবিল থেকে। মনোরমার সে শক্তি আছে। লোকটিকে কিন্তু এখানে মানায় না। ঠিক যেন মনে হয় গরিবের ঘরে এসে ঘুমিয়ে আছে কোনো রাজপুত্তুর!

কিন্তু এ কতক্ষণ এখানে আরাম করে ঘুমোবে। একটু পরেই লোকজন আসবে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে পারে। যা হোক, একটা কিছু বলে দিতে তো মানুষের জিভে আটকায় না—

আমরা চারজন দরজার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। কে আগে লোকটিকে ডাকবে ঠিক করতে পারছি না। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় লোকটি নিজেই চোখ মেলল।

আমাদের চারজনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটো বজ্জে বজ্জে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, আমি কোথায়?

রতন বললে, আপনার অসুখ করেছে।

আপনারা কারা!

পরাণ বললে, কাল আমরাই তো আপনাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেলাম, মনে নেই?

ও। কিন্তু এটা তো বিছানা।

হ্যাঁ, বিছানা। এটা চায়ের দোকানের মালকিনের বিছানা।

রতন লোকটির কপালে হাত রেখে বললে, এখনও তো বেশ জ্বর আছে দেখছি। তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়। আপনি হাসপাতালে যেতে পারবেন?

লোকটি বললে, কোনো দরকার নেই! আমি খানিকটা বাদে ঠিক হলে আপনা আপনি চলে যাবো। আমি যে এখানে আছি, সে কথা কারুকে বলার দরকার নেই।

কেন? আপনি কে?

লোকটি হাত জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন। আমি কোনো খারাপ লোক নই। আমার পরিচয় এখন জানাবার অসুবিধে আছে।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের সঙ্গে হাত জোড় করে কথা বললে আমাদের গা চিড়চিড় করে। এরকম ন্যাকাপনা আমার একদম সহ্য হয় না। দরকারের সময় হাত জোড় করে আবার অন্য সময় চোখ রাঙানো, এসব আমরা ঢের দেখেছি। কিন্তু লোকটির মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারলাম না। লোকটি এমনভাবে কথা বলছে, যাতে মনে হয়, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে , বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে।

বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যাবার কথা। আর তো বেশি দেরিও করা যায় না। হপ্তায় এই একটা দিনই তো নিজের হাতে বাজার করা।

বেরিয়ে এসে দেখি, মনোরমা রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে ফেলেছে। দুধ জ্বাল দিচ্ছে। আমাদের দেখে বললে, তোমরা একটু বসো গো। চায়ের জল এবার চাপাব। কেমন দেখলে।

এখনও তো বেশ জ্বর!

কাল কিছু খায়নি। এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিই, কি বলো?

দে, তাই দে!

চা-টা খেয়েই আমরা দৌড় লাগালুম। সেদিন সারাদিনে আর চায়ের দোকানে যাওয়া হল না। কারখানা বন্ধ থাকলে আর এত দূরে বার বার আসা হয় না। রবিবারে এই জন্যই এ দোকানে খদ্দের খুব কম থাকে।

এরপর দিন তিনেকের মধ্যেও লোকটি গেল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুকে অসহ্য ব্যথা। রতনের ধারণা ওর নিমোনিয়া হয়েছে। জিতেনের ধারণা, ক্ষয়কাশ। এসব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে মনোরমার কি থাকা উচিত? কিন্তু মনোরমা দিনরাত সেবা করছে লোকটাকে। এমনকি দোকান চালাবার দিকেও তার মন নেই, খদ্দেররা চায়ের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে যায়। এমনকি আমরা যে মনোরমার গার্জেন, আমাদের দিকেও তার নজর নেই আর। আমরা কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তা বলে কী লোকটাকে মরে যেতে দেব। একটা ভদ্দরলোকের ছেলে, সে কি আমার হাতে জল খেয়ে মরতে এসেছে? তোমাদের মায়া হয় না।

রতন এক কবিরাজের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ এনে দিয়েছে। কথাটা সে আমাদের কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নজর এড়বার উপায় নেই। ধরা পড়ে গিয়ে সে বলল, বুঝলি না, ওকে তাড়তাড়ি সারিয়ে তুলে বিদায় করতে পারলে তো আমাদেরই সুবিধে। নইলে, মনো যেমন নাওয়াখাওয়া ভুলে গেছে, তাতে দোকানটাই না উঠে যায়!

জিতেন বলল, আজ সকালে বটতলায় শুনলাম, দুটো লোক বলাবলি করছিল যে, জগুদার চায়ের দোকানে কে একটা লোক নাকি লুকিয়ে আছে। এখন এ কথাটা চাউর হয়ে গেলেই তো বিপদ!

আমরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম। সত্যি তো বিপদের কথা। লোকটা নিজের পরিচয় জানাতে চায় না। আমরা মনোরমার বিপদে-আপদে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু মনোরমাকে এই বিপদ থেকে কী করে বাঁচাবো।

পাঁচদিনের মাথায় লোকটা অনেকটা সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসল! এর মধ্যে গত দু'দিন মনোরমা চায়ের দোকান বন্ধই রেখেছিল। সবাই জানে মনোরমার অসুখ। শুধু আমরা আসল ঘটনাটা জানি। আমরা চুপিচুপি সন্ধের দিকে একবার এসে খবর নিয়ে যাই। সে-সময় মনোরমা আমাদের চা খাওয়াতেও ভুলে যায়।

লোকটা বিছানায় উঠে বসেছে, আমরা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম। মনোরমা ঘরের কোণে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা আমাদের দেখে বলল, এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম মনে হচ্ছে।

আমরা চারজনে ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়লাম। আমাদের বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ। লোকটা তাহলে এবার বিদায় হবে। আবার শনিবার এসে গেছে, আবার আমরা মনোরমাকে নিজেদের করে পাবো।

লোকটা মনোরমার দিকে তাকিয়ে বলল, এঁর সেবাতেই বেঁচে গেলাম। এঁর শরীরে খুব দয়া-মায়া আছে! নইলে, আমি অচেনা-অজানা লোক।

মনোরমার শরীরে যে দয়া-মায়া আছে, এ কথা আমরা প্রথম অন্য কারুর মুখে শুনলাম। সবাই জানে, সে দুর্দান্ত রাগী আর জাঁদরেল। অবশ্য মনোরমা কী রকম সে-কথা আর আমাদের বলতে হবে না। দয়া না থাকলে সে আমাদের কারুর পায়ে ঝিঁঝি ধরলে হাত ধরে টেনে তোলে?

লোকটি বলল, এর ঋণ কী করে শোধ করে যাবো, জানি না। আমার কাছে টাকাপয়সা কিছুই নেই—

মনোরমা ঝংকার দিয়ে বলল, থাক আপনাকে আর ঋণ শোধের কথা চিন্তা করতে হবে না , এখনও হাঁটতে গেলে পা টলটল করে।

লোকটি বলল, তবে আমি উপকার ভুলি না। একদিন ঠিক আবার ফিরে আসব, যদি বেঁচে থাকি।

সে তো পরের কথা। এখন আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে? আগে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করুন।

লোকটা বলল, তা মন্দ না। বেশ, খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে তারপর আমি এই রেস্টুরেন্টে বয়ের কাজও করতে পারি। লোককে চা দেব, কাপ ডিশ ধুয়ে দেব।

পরদিন আমরা গিয়ে দেখি, দোকান খোলা, কিন্তু একজনও খদ্দের নেই। ক্যাশ কাউন্টারে মনোরমা একা বিমুখ হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেও একটা কথা বললে না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল? সেই লোকটা কোথায় গেল? মনোরমা ডান হাতখানা হাওয়ায় ফেরালো শুধু?

কী হয়েছে, মনো দিদি? হলটা কী?

মনোরমা চেঁচিয়ে ধমকিয়ে বলল, চলে গেছে। সে চলে গেছে।

আমাদের আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল। চলে গেছে তো আপদ গেছে!

আবার চায়ের দোকানের বয় হবার কথা বলছিল! রাজপুত্তুরের মতো চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানে বয়গিরি, যতসব ন্যাকাপনা কথা?

কখন গেল? কী করে গেল?

সে কি আমাকে বলেছে? একবার ঘুণাক্ষরে জানতেও দিলে না। আমি তাকে একলা রেখে একটু খালপাড়ে চান করতে গেছি—ফিরে এসে দেখি সে নেই। যে মানুষটা ভালো করে হাঁটতে পারে না, সে এমনি এমনি চলে গেল!

নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো ছিল না। কিছু নিয়ে-টিয়ে যায়নি তো?

মনোদিদি, সে কিছু চুরি করেনি তো?

মনোরমা বললে, আহ তোমরা চুপ করবে, আমার ভালো লাগছে না। কী এমন হাতি ঘোড়া আছে আমার, যে সে নেবে!

ধমক খেয়ে আমরা চুপ করে গেলাম।

তারপর শনিবার এলো, কিন্তু মনোরমা আর গাইল না। নাচল না। আমাদের আনি মানি জানি না খেলা হল না। মনোরমা আর সেই মনোরমা নেই, সে আর আমাদের গ্রাহ্য করে না। ঠায় চুপচাপ বসে থাকে। এমনি করেই দিনের পর দিন যায়। আমরা বুঝতে পারি, সেই লোকটা অন্য কিছু চুরি না করলেও সম্পূর্ণ চুরি করে নিয়ে গেছে মনোরমার মন। সেই মনটার চেহারা যে কীরকম তা আর কখনও বুঝিনি।

রতন একবার সাহস করে বলেছিল, ও মনো, সে লোকটা চলে গেল বলে তুই কতদিন আর এমনি করে থাকবি? দোকানটা যে যায়।

মনোরমার চোখের কোণে জল আসে। আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু সে যে আবার ফিরে আসবে বলেছে!

ওসব শহুরে লোকের ন্যাকাপনা কথা। এর কি কোনো দাম আছে? এ কথা আমরা মনোরমাকে বোঝাই কী করে?

যদি সম্ভব হত, আমরা লোকটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতাম এখানে। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজতে যাব? আমাদের কারখানায় যে-কোনোদিন লক আউট হতে পারে, এখন একটি দিনও কাজ কামাই করতে ভরসা হয় না।

তবু রাগে আমাদের গা জ্বলে যায়। আমাদের আর কিছু নেই। সংসারেও শুধু নেই, নেই, নেই। আমাদের ধর্মেন্দর-হেমা মালিনী নেই, বাকি পৃথিবীর কিছুই জানার দরকার নেই। শুধু আমাদের মনোরমা ছিল, কিন্তু সেই লোকটা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, শহুরে মানুষ— ওদের তো কত কিছু আছে, কত রকম আমোদ আর রঙ্গ রস। তবু সে কেন আমাদের মনোরমার মনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

***